ব্রহ্ম-সাধন।

শ্রীকালীনাথ দত্ত প্রণীত।

উৎসর্গ পত্র।

পরম ভক্তিভাজন

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য
মহাশয় শ্রীচরণ-কমলেষু।

আর্য্য,—

আমার জীবন-বৃক্ষের প্রথম ফল "ব্রহ্ম-সাধন" আমি আপনার চরণে উৎসর্গ করিলাম। আমার ধর্ম্ম-জীবনের বীজ আপনার মুখামৃত হইতে প্রসূত, অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনারই অমৃতবর্ষী উপদেশ সকল, যাহা ব্রাহ্মসমাজের বেদী এবং সিন্দুরিয়াপটীর ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে নিঃস্যন্দিত হইয়া, আমার এই মলিন প্রাণে এক অপূর্ব্ব স্রোত খুলিয়া দিয়াছিল, তাহা কস্মিন্ কালে আমার জীবনে বিস্মৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই পরমৌষধি সেবনে আমার যৌবন-সুলভ চাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়াছে, এবং বিগত পঞ্চত্রিংশৎ বৎসরকাল আমাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর-বিস্মৃত হইতে দেয় নাই। যদি এই সুযোগ আমার ভাগ্যে না ঘটিত, কোন্ বিষয়াবর্ত্তে যে আমি ডুবিয়া মরিতাম, তাহার নিশ্চয়তা কি? সে সময় আপনার প্রেমোজ্জ্বল মুখশ্রী চক্ষে দর্শন বা চিত্তে স্মরণ করিবামাত্র, আমার মৃত-প্রাণে জীবন সঞ্চার এবং অন্তরে ঈশ্বর স্ফূর্ত্তি হইত। আমার

জীবনে এমন দিন কাটিয়া গিয়াছে, যখন আমি, যেখানে—যত-দূরে থাকি না কেন, আপনার বহির্ব্বাটীর দক্ষিণ দিকের দ্বিতল গৃহের মধ্যে আপনার পরম পবিত্র সন্নিধানে নিয়ত কাল বাস করিতাম, এবং সেই মধুর ভাব-যোগে ঈশ্বর সহবাস-সুখ উপলব্ধি করিতাম। দুর্ভাগ্যক্রমে এই অপূর্ব্ব অবস্থা আমার জীবনে অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। শীঘ্রই প্রতিকূল ঘটনা সকল আসিয়া আমার সেই সৌভাগ্য হরণ করিল। কিন্তু ইহার স্মৃতি আজিও আমাকে গন্তব্য পথে সহায়তা করে। এই জন্য আমার ধর্ম্মতরুর প্রথম ফলটী আমি আপনার চরণে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাহা আপনার হস্তে রোপিত, অঙ্কুরিত ও পালিত হইয়াছে, তাহা যে আপনারই পিতৃ-চরণে উৎসর্গীকৃত হওয়া স্বভাবের বিধান, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

আপনি যখন "সমদর্শী"তে "হিন্দু ও য়ীহুদা জাতির বিশেষ ধর্ম্মভাব" প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া লেখকের নিকট আপনার সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং সেই লেখকের "আত্ম-দর্শন" প্রস্তাবটী "তত্ত্ব-কৌমুদী" পত্রিকায় পাঠ করিয়া সেই প্রবন্ধের চতুঃপার্শ্বে আপনার অনুকূল মন্তব্য নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বলিয়া যখন বন্ধুমুখে শ্রবণ করি, তখন আমি এই উভয় প্রবন্ধের মূলে আপনারই পিতৃত্ব স্মরণ করিয়া মনে মনে আপনারই চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিয়াছিলাম। এখন এই দুই প্রস্তাব অন্য কয়েকটীর সঙ্গে "ব্রহ্ম-সাধনের" অঙ্গীভূত হইল। "এ সমস্তই যে আপনার রোপিত বৃক্ষের ফল"—একথা কি আমি ভুলিয়া থাকিতে পারি? সেই ফল আদ্যো-

পাস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আপনার অনুগ্রহের সমস্ত স্মৃতি আমার অন্তরে জাগরুক হইয়া উঠিল;—তাই আজ এই অনুপযুক্ত উপহারটী লইয়া আপনার চরণ প্রান্তে উপনীত হইলাম। ইহার প্রতি আপনার স্নেহ-দৃষ্টি পতিত হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

কলিকাতা।
১১ই মাঘ, ১৮১৪ শক।

প্রণত,—
শ্রীকালীনাথ দত্ত।

সূচী-পত্র।

ব্রহ্ম-সাধন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিগূঢ় প্রেম। *

উপাস্য দেবতার প্রতি নিগূঢ় প্রেম অন্তরে উদয় হইলে, উপাসকের হৃদয় একটী নূতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রেমের যে সমস্ত লক্ষণ সচরাচর উল্লেখিত হইয়া থাকে, সে অবস্থা তাহার অতীত। সে অবস্থা এই যে, সাধক তাঁহার অন্তরস্থিত প্রেমকে গোপন করিতে অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হন। তিনি তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম দেবতাকে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া সেই অতীন্দ্রিয় দেশে তাঁহার সঙ্গে গোপনে মিলিত হইতে চান। তিনি লোকের চক্ষুকে ভয় করেন, সুতরাং সে চক্ষুর অন্তরালে গিয়া তাঁহার সত্য শিব সুন্দর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রিয়-জন-সমাগম-সুখ অনুভব করেন। তিনি সে ভাব কেন সযত্নে গোপন করিতে ভাল বাসেন, কেন লোকের চক্ষুকে ভয় করেন? এ প্রশ্নের গূঢ় কারণ আছে। তিনি এ জন্য ভয় করেন না যে, লোকে তাঁহাকে উৎপীড়িত করিবে। নির্য্যাতন-ভয়

* তত্ত্বকৌমুদী,—১৭৯৯ শক, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ; ১৮০০ শক, ১লা ভাদ্র।

প্রকৃত সাধকের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। তিনি এজন্য তাঁহার অন্তরের ভাব গোপন করেন না যে, লোকে সে ভাবের আভাস না পাইয়া তাহার সুখাস্বাদন হইতে বঞ্চিত থাকে। এরূপ সঙ্কীর্ণতা প্রেমিক হৃদয়ে কখনও স্থান পায় না। তাঁহার ভয়ের ও হৃদয় ভাব গোপনের কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহা এই জন্য, পাছে অপ্রেমিক নিষ্ঠুর সংসার তাঁহার সেই নিগূঢ় ভাবের জন্য তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম পদার্থকে উপহাস ও বিদ্রূপের বিষয় করিয়া ফেলে। তিনি লোকের সহস্র অপমান ও নির্য্যাতন অনায়াসে অক্ষুব্ধ হৃদয়ে সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণের প্রিয়তমের প্রতি লোকে যে একটী উপহাস বাক্য প্রয়োগ করিবে, তাঁহার অন্তর প্রদেশে প্রতি নিয়ত যে প্রেমের তরঙ্গ উঠিতেছে লোকে তাহাকে যে বিদ্রূপের বিষয় করিয়া তুলিবে, তাহা তিনি কখনই সহ্য করিতে সক্ষম নহেন। তিনি বিদ্রূপ ও উপহাসপরায়ণ সংসারের সম্মুখে তাঁহার প্রিয় সুহৃদের প্রিয়তম নামটীও প্রকাশ করিতে ভীত ও সঙ্কুচিত হন। তিনি হয়ত এক সময়ে নির্ভীকচিত্তে তাঁহার উপাস্য দেবতার মহান্ নাম বজ্রধ্বনিতে প্রচার করিয়া দুরন্ত সংসারকে পরাস্ত করিয়াছেন; কিন্তু যখন তাঁহার হৃদয়-ভাবের সেই উত্তাল তরঙ্গ প্রশমিত ও ঘনীভূত হইয়া নিগূঢ় প্রেমের আকার ধারণ করিল, তখনই তাঁহার অন্তরাকাশে লজ্জা, ভয়, গোপনেচ্ছা প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া সেখানে যুগান্তর উপস্থিত করিল। তাঁহার মুখে আর কথাটীও নাই। সংসার যতদূর পর্য্যন্ত সহ্য করিতে শিখিয়াছে, তিনি ততদূর পর্য্যন্ত আত্ম প্রকাশ করিতে কখনই সঙ্কুচিত হন না; কিন্তু তাঁহার ভিতরের কথা তাঁহার সম-হৃদয়

দুই একটী বন্ধু বান্ধব ভিন্ন আর কেহ শুনিতে পান না। বাহিরের লোকে মনে করিতে পারে যে, তাঁহার ভাবের স্রোত বন্ধ হইয়াছে; কেননা, তাহারা তাঁহার নিকট যে সকল উপদেশ বাক্য শ্রবণ করে, তাহা তাদৃশ সতেজ ও জীবন্ত নহে। তিনি যখন ইহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করেন, তখন সেই অগাধ প্রেমের সমুদ্রের যে গভীর স্থানে তিনি নিমগ্ন হইয়া বাস করিতে-ছেন, সেখানে থাকিয়া তিনি ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে অসমর্থ; সুতরাং তাঁহাকে অনেক দূর উপরে ভাসিয়া উঠিয়া ইহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়, স্বস্থান ভ্রষ্ট না হইয়া তিনি বাহিরের সঙ্গে মিলিত হইতে পারেন না। কিন্তু সেখানে তাঁহার অন্তরের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারেন না। লোকে কেন না মনে করিবে, তাঁহার ভাবের স্রোত বন্ধ হইয়াছে? লোকে বাহির হইতে যেরূপ দৃষ্টিগোচর করে, তদনুসারেই বিচার করিয়া থাকে। নিগূঢ় প্রেমিকের প্রচার-ক্ষেত্র সুতরাং তাদৃশ বিস্তৃত হইতে পারে না। তিনি যতই প্রেমের অগাধ সাগরে প্রবিষ্ট হন, ততই তাঁহার প্রচার-ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া যায়। তিনি মনের কথা ব্যক্ত করিবার জন্য দুই একটী লোক অন্বেষণ করেন এবং সৌভাগ্য ক্রমে যদি কখন প্রাপ্ত হন, তবে প্রাণের দ্বার খুলিয়া আপনিও কৃতার্থ হন, অন্যকেও কৃতার্থ করেন। এরূপ সঙ্গী যদি না মিলিল, তবে তাঁহার মৌনব্রত কে ভঙ্গ করে? সে অবস্থায় তাঁহার হৃদয়ের ভাব তিনি যে প্রকাশ করিতে অসমর্থ, তাহা নহে; উপযুক্ত লোক মিলিলে তাহা তখনই সহজে প্রকাশ হইয়া পড়িল। না মিলিলে সে ভাব অন্তর্ম্মুখে আরও গভীর প্রদেশ ভেদ করিয়া ক্রমশই

নিমগ্ন হইতে লাগিল, দুর্গম প্রদেশের অলৌকিক শোভা দেখিতে দেখিতে চলিল।

প্রেমের শাস্ত্রে সাধনের গুহ্য কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। যিনি তাহা যেখানে সেখানে প্রকাশ করেন, তিনি কখনই প্রেমিক নহেন। যিনি সাধনের নিগূঢ় ব্যাপারকে লোকের উপহাস ও বিদ্রূপের লক্ষ্য স্থলে আনিয়া নিক্ষেপ করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত সাধক নহেন। তিনি প্রেম-শাস্ত্রের মর্ম্মানভিজ্ঞ নিষ্ঠুর বণিক মাত্র। তিনি তদ্দ্বারা সংসারের পণ্য দ্রব্য বিনিময় করিতে চান,—সংসারের মান সম্ভ্রম ক্রয় করিতে চান। এরূপ নীচ লক্ষ্য সিদ্ধি করিবার জন্য ভিতরের গুহ্য কথা প্রকাশ করিলে, তাঁহাকে প্রেম-রাজ্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রকৃত সাধক-সংসারের কৃপার পাত্র হইয়া থাকিতে হয়। তিনি আপনিও উপহাসাস্পদ হন, এবং প্রেম ও ধর্ম্মের উপরে সংসারের উপহাস ও বিদ্রূপ আনয়ন করেন। তিনি আপনিত নষ্ট হইলেন, কিন্তু যাঁহার নাম এতদিন প্রচার করিলেন,—যাঁহার নাম এতদিন সাধন করিলেন, তাঁহার নামেও লোকের অবিশ্বাস বর্দ্ধিত ও কলঙ্ক সঞ্চিত করিয়া গেলেন। হে সাধক! তুমি কোন্ প্রাণে এরূপ নিষ্ঠুর ও কঠোর হইবে,—তুমি কোন্ প্রাণে তোমার উপাস্যের নামে কলঙ্ক আনিবে, এবং তাঁহাকে লোকের উপহাস ও বিদ্রূপের সামগ্রী করিবে? তোমার কেমন প্রেম, জানি না; এই নিদারুণ কার্য্য করিতে তোমার মনে ব্যথা লাগিবে না? স্বার্থ-সাধনের জন্য তুমি অনায়াসে তোমার এতদিনের ইষ্ট দেবতাকে দুর্নামগ্রস্ত করিয়া যাইবে! হে প্রেমিক, ক্ষান্ত হও; তোমার

আপনার মস্তকে তোমার সমস্ত দোষভার গ্রহণ কর এবং প্রেমের অনুরোধে তাঁহার পবিত্র মহৎ যশকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা কর; নচেৎ তোমার রক্ষা নাই।

নিগূঢ় প্রেম আপনাকে আপনি জানে না। প্রকৃত প্রেমিক আপনার প্রেমের বিষয় আপনি অবগত নহেন। তিনি যে তাঁহার প্রেমাস্পদকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভাল বাসেন, তাহা তিনি নিজে অনুভব করিতে সমর্থ নহেন। নিগূঢ় প্রেম আপনাকে দেখিবারি সময় অন্ধ হয়। নিগূঢ় প্রেম স্রোতোগামী, সুতরাং উন্নতি দেখিতে পায় না।

নিগূঢ় প্রেমিক প্রেমের অনুরোধে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করেন, তাহা অতি মহৎ ও অসাধারণ হইলেও তাঁহার প্রেমের চক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর ও বৎসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি প্রেমের অনুরোধে গুরুতর ত্যাগ স্বীকার করেন, কঠোর ব্রত ও তপস্যা পরিগ্রহ করেন, প্রাণান্ত পরিশ্রম স্বীকার করেন, এবং প্রচুর দুঃখ কষ্ট বহন করেন; কিন্তু তৎ সমস্তই তাঁহার প্রেমের চক্ষে অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, অতি লঘু ও অতি স্বল্প-মূল্য। নিগূঢ় প্রেমিক আপনার কার্য্য কলাপ দেখিবার সময়ও অন্ধ হন।

নিগূঢ় প্রেমিকের মুখে তাঁহার প্রেমের ব্যাখ্যান কখন শুনিতে পাইবে না। তাঁহার রসনা আপনার কার্য্য কলাপের বর্ণনায় কখনই প্রবৃত্ত হয় না। প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে, তাঁহার মুখে কেবল তাঁহার প্রেমাস্পদের গুণ বর্ণনাই শুনিতে পাইবে, আর কখন কখনও তাঁহার নিজ কার্য্য কলাপের নানাবিধ ত্রুটীর কথাও শুনিতে পাইবে।

নিগূঢ় প্রেম আপনার ত্রুটী ও দোষ দেখিবার সময় সূক্ষ্ম প্রখর ও সুতীক্ষ্ণ-চক্ষু। অন্যের চক্ষে যাহা একটী সামান্য ত্রুটী, নিগূঢ় প্রেমিকের চক্ষে তাহা একটী গুরুতর অপরাধ; তাঁহার চক্ষু তখন একটী অণুবীক্ষণ যন্ত্র। তিনি যখন আত্মানুসন্ধান করেন, তখন তিনি আপনার গুণানুসন্ধানে কখনই প্রবৃত্ত হইতে চান না; কিন্তু দোষ ও ত্রুটীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। আপনার দোষ ও ত্রুটী দর্শনই তাঁহার আত্মানুসন্ধান, সেই জ্ঞানই তাঁহার আত্ম-জ্ঞান। তিনি কি সাধে তাঁহার গুণানুসন্ধানে বিরত থাকেন? তাঁহার যে চক্ষু দোষ দর্শন কালে স্বভাবতই বিস্ফারিত হইয়া উঠে, গুণের দিকে তাকাইলে তাহা আপনা হইতে সঙ্কুচিত ও নিমীলিত হইয়া যায়। সে দিক তাঁহার নিকট নিবিড় অন্ধকার। নিগূঢ় প্রেম অন্যের দোষ ও ত্রুটী দেখিবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া যায়,—তখন তাহার সে কঠোরতা নাই। নিগূঢ় প্রেমিক সর্ব্বদা ক্ষমাশীল, কিন্তু শাসনে পরাঙ্মুখ নহেন।

নিগূঢ় প্রেমিক কি সুখী?—তিনি সুখী বটেন, কিন্তু আত্ম-সুখে সুখী নন। তাঁহার সুখ, তাঁহার প্রেমাস্পদের সুখ দর্শন করিয়া। তাঁহার সুখ, তাঁহার ইষ্ট দেবতার সেবা করিয়া। যে কোন সুখ, আনন্দ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা তিনি নিজে ভোগ করিতে পারিলেই সুখী হন না, তাহা তাঁহার প্রেমাস্পদের চরণে উপহার দিতে পারিলেই—নিবেদন করিতে পারিলেই সুখী হন। তিনি পূজা করেন, কিন্তু সুখ চান না; তিনি সেবা করেন, কিন্তু আনন্দ চান না। আনন্দ উপস্থিত হইলে আনন্দময়ের চরণে উপহার দিয়া, তাহা যাঁহার সম্পত্তি—যাঁহার প্রাপ্য, তাঁহাকে দিয়া কৃতার্থ হন।

নিগূঢ় প্রেমিকের দুঃখ কি?—তাঁহার বিস্তর দুঃখ। তাঁহার দুঃখ,—তাঁহার নিজের ও অপরের জীবনে তাঁহার প্রেমাস্পদের মুখচ্ছবি অস্ফুট দেখিয়া। তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রেমাস্পদের মুখচ্ছবি উজ্জ্বল, নির্ম্মল ও প্রফুল্ল দেখিতে চান; না পাইলে তাঁহার দুঃখের অবধি থাকে না। ব্রহ্মহীন নর নারী তাঁহার দুঃখের কারণ, ব্রহ্মহীন সংসার তাঁহার দুঃখের কারণ। কেন না, সেখানে তাঁহার প্রেমাস্পদের মুখচ্ছবি অস্ফুট বা বিকৃত দেখিতে পান। তাঁহার দুঃখ, তাঁহার নিজের অপরাধ দেখিয়া;—তাঁহার দুঃখ, অন্যের দুঃখ, কষ্ট, অজ্ঞান ও মালিন্য দেখিয়া;—তাঁহার দুঃখ, চতুর্দ্দিকের অনীশ্বরতা দেখিয়া এবং আপনার পাপ, আলস্য ও ত্রুটী দেখিয়া। তাঁহার চক্ষের শোকাশ্রু সেই জন্য বক্ষস্থল বহিয়া পতিত হয়।

নিগূঢ় প্রেমিক অন্যের স্কন্ধে অপরাধ ভার নিক্ষেপ করেন না, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে কেবল নিজের উপরে সকল দোষ ও ত্রুটী আরোপ করেন। জগতে পাপ ও কষ্ট দেখিয়া তিনি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দেন এবং গোপনে অশ্রুপাত করেন।

নিগূঢ় প্রেমিকের চিন্তা কি,—কার্য্য কি? কিসে আপনার ও অন্যের আত্মাতে তাঁহার প্রেমাস্পদের স্ফূর্ত্তি হয়, কিসে সেই স্ফূর্ত্তির অন্তরায় সকল নিষ্কাসিত হয়, এই চিন্তা। তাঁহার কার্য্য, সেই অন্তরায় সকল নিষ্কাসিত করা এবং সেই স্ফূর্ত্তি সাধন করা। নিগূঢ় প্রেমিক সে জন্য কোন ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করেন না, পরন্তু তাহাতে সুখানুভব করেন। নিগূঢ় প্রেমিক সেজন্য কোন কার্য্যকে সামান্য বা হেয় জ্ঞান করেন না, কিন্তু অতি তুচ্ছ কার্য্যকেও মহৎ কার্য্য জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠানে

প্রবৃত্ত হন। যে প্রেম কার্য্যকে হেয় জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করে, তাহা নিগূঢ় প্রেম নহে।

নিগূঢ় প্রেমিক মহৎ হইলেও আপনার মহত্ত্ব দেখিতে পান না, তিনি বৃহৎ বৃহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও কখন আপনাকে মহৎ বলিয়া জ্ঞান করেন না। আপনাকে দীন ও সামান্য বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। সে বিশ্বাস কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। লোকের প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া, দেশে বিদেশে তাঁহার গুণকীর্ত্তন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও বিস্মিত হন; এবং মনে মনে বিশ্বাস করেন এবং মুখেও ব্যক্ত করেন যে, সে প্রশংসা অপাত্রে পতিত হইতেছে; তিনি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। নিগূঢ় প্রেমিক কখনও কাহারও প্রাপ্য সুখ্যাতি অপহরণ করেন না, বরং যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সমস্ত সুখ্যাতির অধিকারী বলিয়া সর্ব্বক্ষণ বিশ্বাস ও ব্যক্ত করেন। নিগূঢ় প্রেমিক নিন্দাতে দুঃখিত হন না, বরং আপনাকে তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস ও ব্যক্ত করেন। তাঁহার সুখ দুঃখের সঙ্গে নিন্দা প্রশংসার কোনও সম্পর্ক নাই।

নিগূঢ় প্রেমের বিশ্রাম আছে। যিনি কার্য্য করেন, তাঁহার বিশ্রাম আবশ্যক। তাঁহার বিশ্রাম সেই অনন্ত শয্যা। সেখানেই তাঁহার শ্রান্তির শান্তি হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চরিত্র সংগঠন।*

মানুষের আত্মবিকাশ কোন সীমা বা গণ্ডীর মধ্যগত হইয়া চিরদিন থাকিতে পারে না। "এই পর্য্যন্ত",—মানবাত্মা এই ক্ষুদ্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে নাই। যে কোন সীমা ও গণ্ডীর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে আহ্বান কর না কেন, তাহা সুদূরব্যাপী হইলেও এক দিন না একদিন সে সেই সীমাকে অতিক্রম করিয়া দূর হইতে তাহাকে উপহাস করিতে থাকিবে। "আমিই গম্য পন্থা",—এই গুরুবাক্য মানুষের সাময়িক সহায় হইতে পারে, কিন্তু চির দিনের সহায় হইতে পারে না। আজ যে আদর্শকে মস্তকোপরি রাখিয়া তুমি আপনাকে কৃতার্থন্মন্য বোধ করিতেছ, কাল তাহা তোমার পদতলে পড়িয়া অবলুণ্ঠিত হইবে।

মানবের আত্মা যখন অনন্ত বিকাশ-প্রবণ, তখন তাহার সংগঠন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অনন্ত ভবিষ্যৎ যাহাকে সংগঠন করিতে থাকিবে, সে কিরূপে এখানে এই অনন্ত মঞ্চের প্রথম সোপানে আপনাকে সংগঠন করিয়া তুলিবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা তাদৃশ কঠিন নহে। মানবাত্মার অভ্যন্তরে যে সমস্ত অনন্তবিকাশোন্মুখ দিব্যাঙ্গ অব্যক্ত অবস্থায় নিহিত আছে, সেই সমস্ত যখন সুব্যক্ত হইয়া একটি সম্পূর্ণ আকারে পরিণত হয়,

---

* তত্ত্বকৌমুদী,—১৮৬০ শক, ১৬ই শ্রাবণ।

তখনই মানবের চরিত্র সংগঠন হইল, বলা যাইতে পারে। যতদিন সেই দিব্যাকৃতিটী সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত তাহার অন্তর্নিহিত গর্ভকোষ হইতে বহির্গত না হয়, ততদিন কোন চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। মানবের চরিত্র আর কিছুই নহে, তাহার আভ্যন্তরিক উচ্চ প্রকৃতির আকার বা যথাস্থান-সমাবিষ্ট অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির সমষ্টি মাত্র। সেই আকার বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি যখন তদীয় বীজকোষ মধ্যে অপ্রকাশিত,—সুতরাং কার্যসাধনের অনুপযোগী থাকে, তখনই চরিত্র অসংগঠিত অবস্থায় রহিয়াছে, বলা যায়। যখন সেই আভ্যন্তরিক দিব্য প্রকৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কার্য্যোপযোগী হইয়া যথোচিত অনুষ্ঠান বা আচরণে সমর্থ হইল, তখনই চরিত্রটী সংগঠিত হইল বলিতে হইবে। সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি ক্রমে দৃঢ়িষ্ঠ হইবে, ক্রমে বলিষ্ঠ হইবে, ক্রমে অনন্তের অভিমুখে বিকশিত হইবে; কিন্তু চরিত্রের গঠনটি নিয়তকাল সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে একপ্রকার অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যাইবে।

সকল মানুষের চরিত্র একরূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইলেও, —একরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট হইলেও তাহার গঠন কোন দুই মানুষে একরূপ নহে। যেরূপ মানুষের দেহাকার ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ মানুষের চরিত্রের গঠনও ভিন্ন ভিন্ন।

সকল মানুষই উচ্চ প্রকৃতির বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করে। সেই উচ্চ প্রকৃতি পিতা মাতার মানসিক প্রকৃতির একটী আচ্ছাদন লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। সেই আচ্ছাদনটী সকল সময়ে পিতা মাতার বিভিন্ন বা সম্মিলিত মানসিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে; সেই মানসিক প্রকৃতি জনন কালে যে অবস্থার অধীন

থাকে, সেই আচ্ছাদনটী সেই অবস্থা দ্বারা রূপান্তরিত হয়; তৎপরে সুদীর্ঘ কাল মাতৃগর্ভে বাস করিবার সময় মাতার বিবিধ মানসিক অবস্থা ও উত্তেজনা দ্বারাও রূপান্তরিত হয়। বিবিধরূপে রূপান্তরিত এই মানসিক আচ্ছাদনটী তাদৃশ নির্ম্মল না হইলে মানুষের চরিত্র গঠনের বিশেষ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। তার পর, শৈশবকালে, পিতা মাতা, অন্যান্য পরিবার ও প্রতিবাসী বর্গের দৃষ্টান্তাদি দ্বারা, মানুষের সেই উচ্চ প্রকৃতি আর একটি আচ্ছাদন লাভ করে। সেই আচ্ছাদনটী তাদৃশ নির্ম্মল না হইলে, তাহাও তাহার চরিত্র বিকাশের আর একটী অতিরিক্ত অন্তরায় হইয়া উঠে। তার পর, শিক্ষাকালে দেশের প্রচলিত সংস্কার, দেশাচার, নীতি ও ব্যবস্থা সমূহ হইতে আর একটী আচ্ছাদন লাভ করে। তাহাও তাদৃশ নির্ম্মল না হইলে, তাহার চরিত্র সংগঠনের তৃতীয় অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। এই ত্রিবিধ আচ্ছাদনের মধ্যে আমাদের উচ্চ প্রকৃতি নিপতিত। এই ত্রিবিধ আচ্ছাদন ভেদ করিয়া সেই প্রকৃতিকে আত্মবিকাশ লাভ করিতে হইবে।

মনুষ্যের চরিত্র নির্ম্মাণের ভার কেবল তাহার নিজ হস্তে নহে। যদিও পরিণামে এ ভার তাহার নিজের উপরে পতিত হয়, কিন্তু চরিত্রের প্রথম পত্তনে নানাবিধ অবস্থা আসিয়া তাহার বিকৃতির কারণ পূর্ব্বেই সংঘটন করিয়া রাখে। জন্মদান কালে যদি পিতা মাতা নিজ নিজ দায়িত্বের অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন, গর্ভভার বহনকালে মাতা যদি ভাবী সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া আপনার চিত্ত-বৃত্তিকে যত্ন পূর্ব্বক যথাপথে নিয়োজিত রাখেন, শৈশবকালে পিতা মাতা ও পরিজনবর্গ শিশু সন্তানের অন্তর্ব্বিকাশের অনুকূল অবস্থার মধ্যে তাহাকে

যদি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে আয়াস স্বীকার করেন, এবং অধ্যয়ন কালে যদি শিক্ষকেরা অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক দেশের প্রচলিত কুসংস্কার, অনিষ্টকর দেশাচার, দুর্নীতি ও দুর্ব্যবস্থার প্রভাব হইতে শিষ্যের মনোবৃত্তিগণকে রক্ষা করিয়া, তাহাকে আত্মবিকাশের অনুকূল সুশিক্ষা প্রদান করেন ; তাহা হইলে, মনুষ্য অতি সহজে আপনার উচ্চ প্রকৃতিকে বিকাশিত করিয়া চরিত্রকে সংগঠিত করিতে পারে। নচেৎ এই চরিত্র সংগঠনে বিবিধ প্রতিকূলতা নিবারণার্থ অনেক আয়াস ও যত্ন স্বীকার করিতে হয় এবং তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। নানা প্রতিকূল অবস্থার প্রভাব বশতঃ মনের গতি যদি দুরন্ত ও দুর্ব্বিনীত হয়, তাহা হইলে আত্মার উচ্চ প্রকৃতির বিকাশ সাধন যে কতদূর কঠিন কার্য্য, তাহা যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ সেইরূপ দুরবস্থার স্রোতে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। সাধুসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, সৎ প্রসঙ্গ, ঈশ্বর-নির্ভর প্রভৃতি আত্মবিকাশের যে সকল উপায় সচরাচর অবলম্বিত হয়, তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত কিছুতেই আকৃষ্ট হইতে চায় না, এবং দৈবগতিকে এই সকল উপায়ের মধ্যে নিপতিত হইলে, তখন কেবল বিসদৃশ ও বিসংবাদী ভাব চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর করিয়া প্রাণ ব্যাকুলিত হয় এবং তাহা হইতে দূরে থাকিবার জন্য স্বতঃই সচেষ্ট হয়। এ অবস্থায় দেব-কৃপা ভিন্ন আত্মবিকাশের আর অন্য উপায় নাই। এরূপ দুরবস্থাপন্ন আত্মাদিগের জন্যই দ্বিজত্ব লাভের প্রয়োজন এবং দেব-কৃপাই তল্লাভের এক মাত্র উপায়। যাঁহারা সুজাত, সুপালিত ও সুশিক্ষিত, তাঁহাদের এরূপ দ্বিজাত হইবার তাদৃশ প্রয়োজন নাও থাকিতে পারে; কিন্তু যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ কুজাত, কুপালিত ও কুশিক্ষিত,

দৈবকৃপালব্ধ দ্বিজন্মলাভ ভিন্ন তাঁহাদের চরিত্র উদ্ধারের আর উপায়ান্তর নাই। এই দ্বিজত্ব লাভের পর, তাহাদের মনের দুর্ব্বিনীত ও দুরন্ত গতি অল্পে অল্পে ফিরিতে থাকে, তাহাদের ইচ্ছা পুরাতন পন্থা, পুরাতন সঙ্গ ও পুরাতন অভ্যাসের প্রতি বীতরাগ হইয়া নূতন পন্থা ও গতি অন্বেষণ করে, তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বশক্তি ও বিবেক ক্রমে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং চরিত্র সংগঠনের সহায়তা করিতে থাকে।

সুজাত, সুপালিত ও সুশিক্ষিতের পক্ষে চরিত্র-সংগঠনার্থ এরূপ দ্বিজত্ব প্রাপ্তির তাদৃশ প্রয়োজন নাই। ঈদৃশ দ্বিজাত অপেক্ষা ঈদৃশ সুজাত শ্রেষ্ঠ। সুজাত আত্মা ঈশ্বরের স্বাভাবিক নিয়মে স্ফূর্ত্তি ও পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। ঈশ্বরের কৃপা তাহার সহায়তার জন্য সর্ব্বদাই তাহার চক্ষের সমক্ষেই রহিয়াছে। যখন প্রয়োজন হইল, অমনি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিবা মাত্র কৃপার স্রোত আসিয়া তাহার অভাবরাশি কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল!

মানুষের চরিত্র, যাহা এই দ্বিবিধ উপায়ের অন্যতর অবলম্বন করিয়া সংগঠিত হইল, তাহা তাহাকে নিজ হস্তে পোষণ করিতে হয়। এ বিষয়ে তাহার স্বাধীন ইচ্ছাই তাহার সহায়। অপর দিক হইতেও সাহায্য আইসে, কিন্তু নিজে অনিচ্ছু ও অনুরাগ-বিহীন হইলে শুদ্ধ বাহিরের সাহায্যে তাহার আর কি করিবে?

সংগঠিত চরিত্রে বিবেকই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, স্বাধীন ইচ্ছা সেই রাজ আজ্ঞার বশীভূত। মনোরাজ্যে প্রবল ও পদস্থ বিবেকই অন্যান্য প্রবৃত্তিপুঞ্জের মধ্যে শক্তি-সাম্য রক্ষা করে। কাহাকেও কখন বঞ্চিত করে না, কাহাকেও কখন অন্যায়

সমাদর করে না, কখন কাহারও পক্ষপাতী নহে, কখনও কাহারো বিপক্ষ নহে।

এই মনোরাজ্যে বৃত্তি সমূহের মধ্যে দুইটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। একটী সম্প্রদায় স্বার্থপ্রমুখ, অপর সম্প্রদায়টী পরার্থপ্রমুখ। প্রথম দলটী পূর্ব্বাহ্নে বিকশিত হয় বলিয়া সচরাচর বলবান ও প্রভাবশালী; সুতরাং প্রতিনিয়ত দ্বিতীয় দলের উপর তাড়না ও উৎপীড়ন করে। বিবেক, যখন স্বহস্তে রাজদণ্ড প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রকৃত ধর্ম্মানুসারে দুর্ব্বৃত্ত দলকে দমনে রাখিয়া সাধুবৃত্তি দিগকে পালন করিয়া থাকেন। ক্রূরধর্ম্মী দস্যুরা কখনই রাজার বন্ধু নহে, এই জন্য চিরকালই রাজক্ষমতাকে পর্য্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করে। যখন বিবেকের প্রাধান্য অপ্রতিবাদে সংস্থাপিত হইল, মানুষের উচ্চ বৃত্তি সকল যথাযোগ্য স্থানে আসিয়া কার্য্য করিতে লাগিল, তখনই চরিত্রের সংগঠন হইয়াছে বলিতে হইবে। সংগঠিত চরিত্রে বিবেকই প্রধান হইয়া মনুষ্যের উচ্চ প্রবৃত্তি সকলকে যথাযোগ্য আসন প্রদান করেন, কিন্তু নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে বঞ্চিত করেন না। এ অবস্থায় চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিয়া যথার্থ স্বাস্থ্য সম্ভোগ করে।

কিন্তু দ্বিজত্ব লাভহেতু মনোরাজ্যে যে সময়ে শুভ পরিবর্ত্তনের সূচনা হয়, সে সময়ে অত্যন্ত সাবধান হইবার প্রয়োজন। জীবনের সে প্রতিক্রিয়ার প্রারম্ভে, তাহাকে কোন বাধা প্রদান করা বিধেয় নহে। সে সময়ে বাধা পাইলে, হয়ত প্রতিক্রিয়া অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। প্রতিক্রিয়ার অবস্থার সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ না হইলে, চরিত্রের গঠন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রতিক্রিয়ার প্রথম অবস্থা যদি অত্যন্ত বলবতী হয়, তাহা হইলে

তাহাকে অল্পে অল্পে সাম্যাবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে; যদি সেই অবস্থা অত্যন্ত মন্দগতি হয়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ প্রতিঘাত আনিবার জন্য উত্তেজক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে; যদি সে অবস্থা যথোপযোগী হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্বাভাবিক গতিতে রাখিতে হইবে। প্রতিক্রিয়ার পরিণত অবস্থায় বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। সেই প্রতিঘাতের পর যেন পুনঃ প্রতিঘাত উপস্থিত না হয়। প্রতিঘাতের পর সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হইলেই মঙ্গল; নচেৎ ঘাত প্রতিঘাতের নিয়মের বশীভূত হইয়া একবার পুণ্যবল ও বারান্তরে পাপের বল প্রশ্রয় পাইতে থাকে। যতদিন চরিত্র সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন এই নিয়মের পরিবর্ত্তনশীল তরঙ্গে একবার উর্দ্ধদেশ, আর বার অধোদেশ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। সময়ে সময়ে পরার্থ-প্রমুখ অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল বিশেষ প্রবল হইয়া বিবেকের নিয়োগ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বার্থপ্রমুখ বৃত্তিনিচয়ের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং মনোরাজ্যের শক্তিসাম্য ভঙ্গ করে। স্বার্থপ্রমুখ বৃত্তি নিচয় দ্বারাই হউক আর পরার্থ-প্রমুখ বৃত্তি নিচয় দ্বারাই হউক, চিত্তের শক্তিসাম্য ভঙ্গ হওয়াই অনিষ্টের মূল। সুস্থ ও সবল শরীরে পিত্ত কফের মধ্যে এইরূপ বৈষম্য উপস্থিত হইলে জ্বরোৎপত্তি হয়। শরীরে এরূপ বৈষম্য একবার উপস্থিত হইলে, অনেক সময়ে তাহা হইতে জোয়ার ভাঁটার ন্যায় জ্বরকালীন বেগ ও মগ্নকালীন অবসাদের ক্রমাবর্ত্ত গতি বিধি হইতে থাকে। অনেকের জীবন এইরূপ ঘাত প্রতিঘাতের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া আছে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রমত্তভাব সমাজের জ্বর-বেগোপম উত্তেজনা প্রকাশ করিয়াছে, তৎপরে সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল পাপের

স্রোত মগ্নকালীন অবসাদের পরিচয় দিয়াছে। এমন কি, চৈতন্য দেবের জীবিতকালেও তিনি তাঁহার ধর্ম্মের সংসারে এই প্রতিঘাতের পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় তাঁহার বর্ষীয়ান্ সহযোগী নিত্যানন্দ প্রভুর অবস্থা দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, তুমি বিবাহ করিয়া সংসারী হও, নচেৎ ধর্ম্ম রক্ষা সহজ হইবে না। ব্যক্তিবিশেষের জীবনে এবং সম্প্রদায় বিশেষের ইতিহাসে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

কার্য্য, চিন্তা ও ভাব,—এই ত্রিবিধ উপকরণ যোগে মানব চরিত্র পুষ্টি লাভ করে। নূতন কার্য্য, নূতন চিন্তা ও নূতন ভাব, চরিত্রের প্রকৃত অন্নপান। আজ যে কার্য্য, চিন্তা ও ভাবে চরিত্রের পুষ্টিসাধন হইতেছে, কিছু দিন পরে তাহাদিগকে পরি-বর্জ্জন করিয়া নূতন কার্য্য, ভাব ও চিন্তা অন্বেষণ ও পরিগ্রহ করিতে হইবে। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। পরিগ্রহণ, পরি-রক্ষণ ও পরিবর্জ্জন, এই নিয়ম সৃষ্টির সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। মানুষের চরিত্র গঠনেও এই তিন শক্তি অলস নহে। এই তিন শক্তি যদি যথানিয়মে কার্য্য করিতে থাকে, তবে মানব চরিত্র অবাধে দিন দিন অনন্তের দিকে অগ্রসর হইবে। চিন্তা হইতে ভাবের উৎপত্তি, ভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি। যখন দেখিবে, চিন্তা, ভাব ও কার্য্যের অল্পতা হইয়াছে, তখন বুঝিবে যে তোমার জীবনের মধ্যে পরিগ্রহণ শক্তিরও অল্পতা হইয়াছে। তখনই সাবধান হইবে। এক কার্য্য, এক চিন্তা, এক ভাব আত্মাকে কিয়দ্দিন পোষণ করিতে পারে,—চিরদিন পারে না। তাহাদিগকে স্বতঃই পরিবর্জ্জন করিতে হয়। এই পরিবর্জ্জন ভিন্ন

চরিত্র পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। চিন্তা ও ভাবের নূতন ক্ষেত্র না পাইলে, চরিত্র হীনবল হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। চিন্তা, ভাব ও কার্য্য,—এ তিনের একটীর অভাবে চরিত্রের পূর্ণতা ভঙ্গ হইয়া যায়।

চরিত্র গঠন যে-বিজ্ঞানের অন্তর্গত, তাহা অদ্যাপি মানব সমাজে অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। এদিকে লোকের দৃষ্টি অদ্যাপি যথোচিত পরিমাণে আকৃষ্ট হয় নাই। জনসমাজ এখনও অপরা-বিজ্ঞান লইয়া ব্যস্ত আছেন, ধর্ম্মসমাজ সকল পুরাতন শাস্ত্র কাহিনী লইয়াই মানবগণের পারলৌকিক সদ্গতির স্তোক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। প্রস্তাবিত বিজ্ঞানের আলোচনা করিবার জন্য কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখি না। এ শাস্ত্রের বেকন অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। এখন এক প্রশ্ন, ব্রাহ্মসমাজ কি পুরাতন শাস্ত্র-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মযাজন করিবেন, না মনুষ্য-প্রকৃতি সংগঠনের সুযোগ্য উপায় আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করিবেন?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্র,—পুরাতন ও নূতন।*

শাস্ত্র কি?—শাস্ত্র ঈশ্বরের সত্য, শাস্ত্র ঈশ্বরের আদেশ, শাস্ত্র ঈশ্বরের বাক্য। শাস্ত্র সুতরাং অনন্ত এবং ঈশ্বরেব সঙ্গে নিত্য বর্ত্তমান। ইহার বক্তা কে?—ইহার বক্তা স্বয়ং ঈশ্বর। ইহার শ্রোতা কে?—ইহাব শ্রোতা সূক্ষ্ম চৈতন্য বিশিষ্ট ঈশ্বরোন্মুখ নর নারীর আত্মা। যদিও শাস্ত্রের শ্রোতা সূক্ষ্ম চৈতন্য বিশিষ্ট ঈশ্বরোন্মুখ নরনারীর আত্মা, কিন্তু তৎ শ্রবণের অধিকারী যাবতীয় নরনারী। ঈশ্বব শাস্ত্রস্বরূপ হইযা প্রত্যেক নরনারীর আত্মাতে বাস কবিতেছেন এবং প্রতিনিযত তাঁহার আদেশ ও সত্য প্রকাশ করিতেছেন। এ সত্য মানুষের স্থূল চৈতন্যে সাক্ষাৎ অনুভূত হয় না। ঈশ্বর পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতব প্রাণীর অন্তরে তাহাদের প্রাণ স্বরূপ হইয়া বাস করিতেছেন; কিন্তু পশু-পক্ষী প্রভৃতি তাহা জানে না, কেন না তাহাদের চৈতন্য অত্যন্ত স্থূল এবং মায়া মোহে নিরবচ্ছিন্ন আচ্ছন্ন। মনুষ্য যত দিন তাঁহার ঈশ্বরকে তাঁহার অন্তরে সুস্পষ্ট অনুভব করিতে না পারেন, তত দিন তাঁহার চৈতন্য ইতর-জীবচৈতন্যের ন্যায় নিতান্ত স্থূল ও মায়ামোহে সমাচ্ছন্ন। কেবল প্রভেদ এই যে, মানবচৈতন্য বুদ্ধি-বিশিষ্ট এবং বিকাশ-প্রবণ; এই জীব-চৈতন্যে সেই বুদ্ধি-শক্তি ও বিকাশ-প্রবণতাব সমধিক অসদ্ভাব দৃষ্ট হয়। মানব-চৈতন্য ক্রমে স্বকীয়

* তত্ত্ব-কৌমুদী;—১৮০০ শক, ১লা বৈশাখ।

স্থূলত্ব পরিহার পূর্ব্বক সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ইহাতেই মনুষ্যের এত মহত্ব, এত গৌরব। মানবীয় স্থূল চৈতন্যে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না, এবং ঈশ্বরের আদেশ ও বাক্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। ঈশ্বর যে মানবাত্মাতে শাস্ত্রস্বরূপ হইয়া বাস করেন এবং প্রতি-নিয়ত তাঁহার আদেশ ও সত্য প্রকাশ করেন, ইহা কেবল মাত্র মানবীয় সূক্ষ্ম চৈতন্যে সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। যত দিন মানুষ এই সূক্ষ্ম চৈতন্য লাভ করিতে সমর্থ না হন, তত দিন তাঁহাকে পুরাতন শাস্ত্র লইয়া থাকিতে হয়।

এখন পুরাতন শাস্ত্র কি, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। যে শাস্ত্র, যে সত্য, যে আদেশ ঈশ্বরের মুখ হইতে সাক্ষাৎ শুনিয়াছি, এরূপ স্পষ্ট উপলব্ধি হয় নাই, তাহাই পুরাতন শাস্ত্র। ইহা আত্মার অবস্থাভেদে নানা রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ যে সমস্ত নীতি ও সত্য, যে উপায়ে হউক, সংসারে পূর্ব্বাবধি প্রচারিত আছে, কতকগুলি লোক অন্ধের ন্যায় তাহাদিগকে মান্য করিয়া চলেন। ইহাঁরা পুরাতন শাস্ত্রাবলম্বীদিগের নিম্নতম শ্রেণীস্থ লোক। ইহাঁরা বেদ, কোরাণ বা বাইবলের পন্থানুসরণ করেন। আর কতকগুলি লোক, কোন পুরাতন শাস্ত্র বিশেষের অনুসরণ না করিয়া, সহযোগীদিগের মধ্যে যাঁহাকে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাপন্ন ও বাক্‌পটু বিজ্ঞ ও সাধু দেখেন, অন্ধবৎ তাঁহারই কথার অনুসরণ করেন। ইহাঁরাও পূর্ব্বোক্ত নিম্নতম শ্রেণীর অন্তর্গত। অলৌ-কিক কার্য্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে, ইহাঁরা কোন সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। শাস্তি-ভয় প্রদর্শিত ও ফল-শ্রুতি কীর্ত্তিত না হইলে, তাঁহারা কোন নিষেধ বিধির তাৎপর্য্য

বুঝিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি লোক, কোন লিপিবদ্ধ শাস্ত্র-বিশেষের বা অলোক-সামান্য মনুষ্য বিশেষের উপর নির্ভর না করিয়া, তৎ প্রচারিত যে সমস্ত সত্যে, তাঁহাদের অন্তরস্থ বিবেক সায় দেয়, কেবল মাত্র তাহাদেরই অনুসরণ করেন। এখানে মানবীয় স্থূল-চৈতন্য অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁরা অপেক্ষাকৃত আভ্যন্তরিক রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, ইহাঁদের চৈতন্যও অপেক্ষাকৃত আভ্যন্তরিক হইয়া উঠিয়াছে। ইহাঁরা সত্য বুঝিবার জন্য অলৌকিক কার্য্য দেখিতে চান না; ফলশ্রুতি ও শাস্তিভয়ের তাদৃশ মুখাপেক্ষা করেন না। ইহাঁদের অন্তরে সত্যের সায় পাওয়া যায়। ইহাঁদের হৃদয়াকাশে বিবেকের অরুণ ভাতি প্রতিভাত হইয়াছে। ইহাঁরা শাস্ত্র বা মহাপুরুষ বিশেষের অবলম্বন যদিও পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু ইঁহাদের সে অবলম্বন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ কতকগুলি লোক শাস্ত্র ও মহাপুরুষ নিরপেক্ষ হইয়া সহজ-জ্ঞান ও বিবেকের অনুরোধে নীতি ও সত্যের অনুসরণ করেন। ইহাঁরা অন্তর মধ্যে সুবিস্তৃত শাস্ত্র দেখিতে পান, ইহাঁরা বিবেকের নিকট সমস্ত তত্ত্ব-শিক্ষা করেন। এখানে মানবীয় স্থূল চৈতন্য সূক্ষ্ম চৈতন্যের অত্যন্ত সন্নিহিত হইয়াছে। ইহাঁরা বিবেকের মধ্যে যদিও ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন নাই, কিন্তু বিবেককে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া তাহার অনুসরণ করেন। ইহাঁরা যদিও শাস্ত্র বিশেষ বা মনুষ্য বিশেষের মধ্যবর্ত্তীত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু বিবেকের মধ্যবর্ত্তীত্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ইহাঁদের বিবেক ইহাঁদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া ইহাঁদের অভ্যন্তরে প্রতি-

নিয়ত বাস করিতেছে। পুরাতন শাস্ত্রের সীমা এই খানেই শেষ হয়।

এখন নূতন শাস্ত্র কি, তাহাব আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। ঈশ্বরের মুখ হইতে যে শাস্ত্র সাক্ষাৎ নির্গত হইয়া মানবীয় সূক্ষ্ম চৈতন্যে যাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়, তাহাই নূতন শাস্ত্র। নূতন শাস্ত্রাবলম্বীদিগের নিকট বিবেক ঈশ্বরের মুখ, তাঁহার কেবল প্রতিনিধি নহে। ইহা বাহ্য-দর্শী স্থূল-চৈতন্যের অধিগম্য নহে, কিন্তু আভ্যন্তরিক সূক্ষ্ম-চৈতন্যেব বিষয়। যাঁহারা এই সূক্ষ্ম-চৈতন্য লাভ কবিযা নূতন শাস্ত্রের অধিকারী হয়েন, তাঁহাদের আর নীতি শাস্ত্রের অনুসবণ আবশ্যক হয না, তাঁহারা প্রতিবারে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া কার্য্য কবেন। তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরে নিত্য বর্ত্তমান। তাঁহাদের শাস্ত্র চিরজাগ্রত, চিরজীবন্ত। যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, সেখানে কে নীতিশাস্ত্রের মৃত বচন স্মরণ করিয়া তাহার অনুসরণ করে? সেখানে ঈশ্বরই স্বয়ং শাস্ত্রস্বরূপ।

এই নূতন শাস্ত্রে, পাপের শাস্তির জন্য বা পুণ্যের পুরস্কার জন্য, স্বতন্ত্র স্বর্গ বা নরক নাই। যিনি শাস্ত্র স্বরূপ, গুরু স্বরূপ হইয়া অন্তরে বাস করেন, তিনিই পাপের শাস্তা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা হইয়া অহরহঃ সেই অন্তরে বাস করিতেছেন। যাঁহারা এই সনাতন নূতন শাস্ত্র অবলম্বন করেন, তাঁহাদের ভূতকালের দিকেও দৃষ্টি নাই, ভবিষ্যতের দিকেও দৃষ্টি নাই; তাঁহাদের দৃষ্টি বর্ত্তমানের উপর। পৌরাণিক শাস্ত্রের,—মহাপুরুষের দিকে ইহাদের লক্ষ্য নাই,—ভবিষ্যতে স্বর্গ ও নরকের প্রতি ইহাঁদের চক্ষু নাই; ইহাঁদের দৃষ্টি অন্তরস্থ নিত্য বর্ত্তমান ঈশ্বরের প্রতি।

লিপিবদ্ধ শাস্ত্র বিশেষের বা মহাপুরুষ বিশেষের নিষেধ, বিধি ইহাঁদের অবলম্বনীয় নহে। ইহাঁদের অবলম্বন, সেই নিত্য বর্ত্তমান ভাগবৎ, যাহা অন্তরে প্রতিনিয়ত প্রোক্ত হইতেছে।

এ নূতন শাস্ত্র প্রতিনিয়ত অন্তরেই স্ফূর্ত্তি পায়, ইহা কথন বাহিরে ব্যক্ত হয় নাই। ইহা অব্যক্ত, চির অব্যক্ত। বাহিরে ব্যক্ত হইলেই ইহার মাহাত্ম্য চলিয়া গেল, ইহার নূতনত্ব দূর হইল;—তৎক্ষণাৎ ইহা পুরাতন শাস্ত্র হইয়া গেল। এই শাস্ত্র ভাষায় অনুবাদনীয় নহে। লেখনীর মুখে বা রসনার অগ্রে এ ভাগবৎ স্ফূর্ত্তি পায় না। এ শাস্ত্র অদৃশ্য ভাবে অদৃশ্য পথে বিচরণ করে। এ শাস্ত্র অকথিত ভাষায় অন্তরাকাশে স্ফূর্ত্তি পায়।

ঈশ্বরোন্মুখ আত্মা এইরূপে সময়ে সময়ে যে সত্য লাভ করিয়াছেন, মৌখিক বাক্যে বা লিপিবদ্ধ শাস্ত্রে, তাহা চিত্রিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু মানুষ যখন উপলব্ধ সত্য প্রতিপ্রসব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে স্মৃতিশক্তি, কল্পনা, বুদ্ধি ও ভাষার সাহায্য লইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ ঈশ্বরের সত্য মনুষ্যের স্মৃতিশক্তি দ্বারা অনুবাদিত হইল, পরে কল্পনা ও বুদ্ধির হস্তে বিকৃত হইল, তৎপরে ভাষার দ্বারা অনুবাদিত হইল। এত বার অনুবাদ হইতে গেলে, সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি রক্ষা পায় না। আবার ইহাও সত্য যে, *জগতের যাবতীয় শাস্ত্রে যে সকল সত্য চিত্রিত হইয়াছে,* তৎসমুদয়ই যে মানবীয় সূক্ষ্ম-চৈতন্যে ঈশ্বরের মুখ হইতে স্পষ্ট প্রোক্ত, এরূপ উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা নহে। অনেকে উন্নত স্থূল চৈতন্যে সত্য উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরই ইহার প্রেরয়িতা, তাহা স্পষ্ট বোধগম্য করিতে পারেন নাই; প্রত্যুত অনুমান ও

যুক্তির সাহায্যে তাহা কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। কেহ কেহ বা সাহসী হইয়া তাহা সাক্ষাৎ ঈশ্বরবাণী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও হয়ত অনেকের কল্পনাসিদ্ধান্ত মাত্র।

আমরা বাহিরের সামগ্রী নাই,—স্থূল চৈতন্য ও পুরাতন শাস্ত্র লইয়া চিরদিন জল্পনা করিবার জন্য আমরা সৃষ্ট হই নাই। আমাদিগকে আভ্যন্তরিক রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হইবে; সেখানকার অনন্ত অদ্ভুত ব্যাপার সকল প্রত্যক্ষ গোচর ও অধ্যয়ন করিতে হইবে। আমাদিগের চৈতন্য ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথে কত মনোহর দৃশ্যাবলী উন্মুক্ত করিবে। আমরা তজ্জন্য কি করিতেছি? সাধন বিনা সে রাজ্যে কাহারো প্রবেশের উপায় নাই। সাধকেরাই এই নূতন শাস্ত্রাধ্যয়নের অধিকারী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সাধনের অবস্থাত্রয়।*

মনুষ্য মাত্রেরই আত্মাতে সেই পরমাত্মার জ্যোতিঃ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পাপী, তাপী, সাধু, অসাধু, কেহই এই অযত্নলভ্য ব্রহ্মদর্শন লাভের অনধিকারী নহে। নিতান্ত পাষাণ হৃদয়েও এই স্বর্গীয় অতিথি মধ্যে মধ্যে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। দুরন্ত নরক সমান হৃদয়ও তাঁহার অগম্য নহে। সমস্ত মানব-হৃদয় সেই প্রেমময় পুরুষোত্তমের বিহার-ক্ষেত্র। এই বিহার ক্ষেত্রে সেই পরম পুরুষ মধ্যে মধ্যে সহসা আবির্ভূত হইয়া তাঁহার প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় প্রদান করেন। নর নারীর হৃদয় প্রদেশের উপর সেই হৃদয়বিহারী পরম দেবতার যে স্বাভাবিক স্বামীত্ব ও প্রভুত্ব আছে, এই স্বর্গীয় আবির্ভাব দ্বারা তিনি স্বয়ং তাহা মধ্যে মধ্যে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। সেই পরমপুরুষ নর নারীর হৃদয়বিহারী প্রাণারাধ্য জীবনবল্লভ, এই সাময়িক আবির্ভাবে সেই পরিচয়ই ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে। প্রথমে বোধ হয় যে, আবির্ভাবে অন্তরাকাশ উজ্জ্বল হইল, তাহা অন্তরের ভাব মাত্র,—মনের অবস্থা মাত্র। দর্শন-শাস্ত্রকারেরা বলেন যে, শিশুরা প্রথমে ভাববাদী হয়; তাহারা যাহা কিছু দর্শন করে, যাহা কিছু শ্রবণ

---

* তত্ত্বকৌমুদী ;—১৮০০ শক, ১৬ই আষাঢ়।

করে, সমস্তকে তাহাদের অন্তরের ভাব মাত্র—মনের অবস্থা মাত্র মনে করে। সেই দৃষ্ট, শ্রুত বিষয়ের স্বতন্ত্র বাহ্যিক সত্ত্বা প্রথমে প্রতীতি করিতে সামর্থ হয় না। পরে ক্রমশঃ যতই তাহাদের বহুদর্শন লাভ হইতে থাকে, ততই তাহারা ভাব-বাদের সীমা পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র সত্ত্বা-বাদের সীমার মধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। জন্মান্ধ বা জন্ম-বধিরেরা যদি কখন চক্ষু বা শ্রোত্র লাভ করে, প্রথমে তাহাদিগকেও এই দশাগ্রস্ত হইতে হয়। মানবের হৃদয়, যখন প্রথমে সেই পরমের আবির্ভাব অনুভব করে, তখন তাঁহার স্বতন্ত্র সত্ত্বাতে সহসা বিশ্বস্ত হইতে পারে না। তাঁহাকেও প্রথমে ভাব-বাদী হইতে হয়। তিনি প্রথমে মনে করেন যে, এই আবির্ভাব তাঁহার অন্তরের ভাব বা কল্পনা মাত্র। কিন্তু বহুদর্শন লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাব-বাদ তিরোহিত হইতে থাকে, এবং স্বতন্ত্র সত্ত্বাবাদ আসিয়া শনৈঃশনৈঃ তাহার স্থান অধিকার করে। আমরা ক্রমশঃ জানিতে পারি, সেই আবির্ভাবের সঙ্গে আমাদের কি মধুর সম্বন্ধ। সেই মধুর সম্বন্ধের বিজ্ঞাপন এই অযাচিত ও অহেতুক আতিথ্য গ্রহণ দ্বারা প্রচার করিয়া, সেই পরম পুরুষ মানুষের অনুরাগ ও প্রেম আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যাঁহারে চিনিতেন না, জানিতেন না, একদিন শুভক্ষণে শুভযোগে সহসা সেই পরম পুরুষের সত্যশিবসুন্দর মূর্ত্তি, তাঁহার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হৃদয়ে আবির্ভূত হইল! চকিতে চমৎকার দৃশ্য দেখিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া গেল! হৃদয়-ক্ষেত্রের উপর দিয়া কোথা হইতে আনন্দের ঝড় বহিয়া চলিল! যেখানে ভীষণ মরুভূমি ছিল, সেখানে প্লাবনের জল উঠিয়া উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল! এই স্বর্গীয়

আবির্ভাব সকল হৃদয়ে সমান আনন্দ উৎপাদন করে না। হৃদয়ের গঠন অনুসারে আনন্দ-স্ফূর্ত্তির তারতম্য হইয়া থাকে। অনুরাগী পাত্রে এই শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, সেই দিন হইতে তাঁহাকে সাধনের পথে সঞ্চরণ করিতে হয়। তিনি যে সুন্দর রূপ দেখিয়াছেন, পুনরায় তাহা দেখিবার জন্য ব্যাকুল হন; তিনি যে মধুর আস্বাদন একবার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আবার প্রাপ্ত হইবার জন্য লালায়িত হন। তাঁহার সংসার-পাশ সেই দিন হইতে শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। সংসার আর তাঁহাকে পূর্ব্বানুরূপ সুখী করিতে পারে না। সুখকে আর তাদৃশ সুখ বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার আত্মা তখন সর্ব্বদাই অতৃপ্ত,—সর্ব্বদা সেই হারাধন অন্বেষণে অন্যমনস্ক। সেই হারাধন পাইবার জন্য তিনি সর্ব্বদা উদ্দেশে প্রার্থনা করেন, এবং ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করেন। তিনি সাধনের অনন্তপথে দাঁড়াইয়াছেন, কে তাঁহাকে আর সেখান হইতে অপসারিত করে? সেই ব্রহ্মামৃতের মধুরাস্বাদ মুহূর্ত্তমাত্রের জন্য যখন তাঁহার ভোগ্য বস্তু হইয়াছে, তখন তিনি আর তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। যেখানে না দেখিয়া অনুরাগ জন্মে,না পাইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়,সেখানে ধর্ম্মভাব সহজে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে অগ্রে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ, পরে সাধন ; সেখানে অনুরাগ উদ্দীপিত থাকিলে, ধর্ম্মভাবের বীজ সহজে বিনষ্ট হইতে পারে না। সে বীজ সেই অবিনাশী হস্তদ্বারা জলস্রোতের সন্নিধানে সংরোপিত হইয়াছে। সে বীজ অবশ্যই শীত গ্রীষ্মের প্রভাবে সময়ে সময়ে শুষ্ক ও নীরস হইতে পারে, কিন্তু তদ্দারা তাহা বিনষ্ট হয় না; পরন্তু বর্দ্ধিত হয়। বিচ্ছেদ মানুষকে সাধক করে; বিচ্ছেদ ভিন্ন,—অভাব

ভিন্ন সাধন অসম্ভব। বিচ্ছেদ ও অভাব সাধনের প্রাণ, এবং প্রকৃত সাধকের অনুরাগানলে ঘৃতাহুতি অর্পণ করিয়া থাকে। সংসার অবশ্যই সময়ে সময়ে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, পাপ অবশ্যই সময়ে সময়ে তাঁহাকে প্রলোভিত করে; কিন্তু তাহারা তাঁহাকে অধিক দিন ভুলাইয়া রাখিতে পারে না,—মোহ তাঁহার হৃদয়ে মনের মত স্থান না পাইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না।

কিন্তু যেখানে এইরূপ অনুরাগের অভাব, সেখানে সাধনের প্রবর্ত্তাবস্থা এইরূপ সুচারুরূপে আরব্ধ হয় না। সেখানে প্রকৃত অনুরাগ উদ্দীপিত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের প্রয়োজন হয়, এবং সেই উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্ত্তাবস্থার প্রকৃত সূত্রপাত হইতে থাকে। এ অবস্থায় ব্যাকুল হইয়া উদ্দেশে প্রার্থনা ও নাম সাধন করাই স্বাভাবিক এবং তাহাই সাধকের একমাত্র সম্বল।

যত দিন ব্রহ্মের আবির্ভাবকে মনের ভাব বা কল্পনা বলিয়া বোধ বা সন্দেহ থাকে,—যত দিন সেই আবির্ভূত দেবতার আদেশ বা নিষেধ বাক্যকে মনঃসম্ভূত বা মনঃকল্পিত বলিয়া উপলব্ধি বা সন্দেহ থাকে,—যতদিন সাধক সেই ব্রহ্মাবির্ভাব ও ব্রহ্মাদেশকে স্বতন্ত্র বহির্ব্বিষয় বলিয়া, হৃদয়ের প্রভু ও জীবনের নেতার আবির্ভাব ও আদেশ বলিয়া প্রতীতি করিতে না পারেন,—যতদিন অন্তরে প্রকৃত অনুরাগের উদ্দীপন হইয়া সাধন পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়েন, না তত দিন সাধক প্রবর্ত্তাবস্থার মধ্যে অবস্থিতি করেন।

প্রবর্ত্তাবস্থা সম্পূর্ণ হইলে সাধক সাধনের মধ্যাবস্থায় উপনীত

হইলেন। সাধক এখন সাধনের বিষয়কে জানিয়াছেন, তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তার উপর তাঁহার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে, তিনি তাঁহাকে হৃদয়ের স্বামী ও জীবনের নেতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি বিচ্ছেদে প্রাণপণ করিয়া সাধন করেন, মিলনে সেই জীবন-স্রোতে আপনার জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়া পরম আরাম ও শান্তি উপলব্ধি করেন। সেই স্বর্গীয় আগন্তুকের সঙ্গে ক্রমে তাঁহার পরিচয় বাড়িতে থাকে। প্রবর্ত্তাবস্থায় তিনি স্বার্থপর ছিলেন, আপনার সুখের জন্য, আপনার মঙ্গলের জন্য তিনি সেই পরমাবি-র্ভাবকে কামনা করিতেন, প্রার্থনা করিতেন। এখন তাঁহার সেই স্বার্থপর ভাব ক্রমে বিদূরিত হইয়া অন্তরে প্রেমের সঞ্চার হইতে লাগিল। প্রবর্ত্তাবস্থায় সেই আবির্ভাব আপনা হইতে আসিয়া তাঁহার নবীন আত্মাকে অতি সন্তর্পণে পোষণ করিয়াছে, এখন তিনি নানা উপায় আবিষ্কার করিয়া সেই স্বর্গীয় আবি-র্ভাবকে পোষণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এখন তিনি ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, সেই স্বর্গীয় অতিথি কিসে তুষ্ট ও কিসে রুষ্ট হইয়া থাকেন। সেই অতিথিকে সৎকার করাই, সেবা করাই করাই তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য মনে করেন। তিনি কি চান, কি বলেন,—ইহাই শুনিবার জন্য তাঁহার হৃদয় উন্মুখ হইয়া থাকে। তিনি হৃদয় দিয়া—প্রাণ দিয়া—জীবন দিয়া—সর্ব্বস্ব দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য লালায়িত হন। প্রবর্ত্তাবস্থায় একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন, এখন সেই প্রেমা-স্পদ তাঁহার নিকট যখন যা চান, তিনি তখনই তাহা তাঁহার চরণে উপহার দিবার জন্য লালায়িত হন। সেই পরম অতিথি তাঁহার কাছে কিছু চাহিলে, তিনি এখন আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান

করেন। সেই হৃদয়-বিহারীর মুখমণ্ডল বিরক্ত দেখিলে, তাঁহার দুঃখের অবধি থাকে না; প্রাণ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া যদি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপর হন না। তিনি সমস্ত হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াও সন্তুষ্ট হন না, প্রাণ দিয়াও তৃপ্ত হন না, প্রীতি ভক্তি সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার অভিলাষ মিটে না। তিনি সমস্ত করিয়াও মনে করেন, কিছুই করিলাম না; সমস্ত দিয়াও মনে করেন, কিছুই দিলাম না। তিনি বিচ্ছেদের সময় চাতকের ন্যায় তাঁহার মুখ তাকাইয়া থাকেন,—আপনার সমস্ত ত্রুটী স্মরণ করিয়া আত্ম-ভর্ৎসনা করিতে থাকেন, এবং মিলনে হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, সমস্ত ভক্তি, সমস্ত মনোযোগ, সমস্ত আদর অপেক্ষা দিয়া সেই প্রেমাস্পদ আগন্তুককে বরণ করিয়া হৃদয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সাধনের মধ্যাবস্থায় প্রবৃত্ত হইয়া সেই হৃদয়বিহারীকে স্বতন্ত্র বহির্ব্বিষয় বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন; কিন্তু এই মধ্যাবস্থা যতই পরিণত হইতে থাকে, তিনি ততই তাঁহাকে আপনার অন্তরের সঙ্গে মিশাইবার জন্য লালায়িত হন,—তিনি তাঁহাকে বহির্ব্ব্যাপার বলিয়া ভাবিতেও কষ্ট বোধ করেন! "তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে তাঁহায় গ্রাস করয়ে কাল।"

যখন সাধক ডাকিবামাত্র দেখা পান, ইচ্ছামাত্র বিচ্ছেদকে মিলনে পরিণত করিতে পারেন,—যখন তাঁহাকে তাঁহার কিছুই অদেয় থাকে না,—যখন হৃদয়বিহারীর সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক নিগূঢ় যোগ সংস্থাপিত হয়, এবং সম্বন্ধ দিন দিন প্রগাঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে, তখন তিনি মধ্যাবস্থা হইতে ক্রমশঃ উত্তীর্ণ হইয়া আর একটী অভিনব অবস্থায় উপনীত হন।

সেই অবস্থা সাধকের সিদ্ধাবস্থা। এ অবস্থায় সেই পরম

অতিথি আর অতিথি থাকেন না,—তিনি তখন গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া যান,—সেই হৃদয়বিহারী আর সাময়িক বিহারী থাকেন না; কিন্তু হৃদয়ের চিরবিহারী হইয়া পড়েন—দেহের মধ্যে প্রধান দেহী হইয়া বিরাজ করেন, সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া সকল কার্য্যে আপনার মহিমা ও লীলা প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় আত্মাতে পরমাত্মাতে বিচ্ছেদ নাই, কিন্তু অবচ্ছিন্ন মিলনই বিরাজ করিতে থাকে। এ অবস্থায় আত্মা সর্ব্বদাই অনুপ্রাণিত থাকে, সর্ব্বদাই ব্রহ্ম-ধামবাসী হইয়া থাকে। এ অবস্থায় আত্মা দ্বারা সেই পরমাত্মা আয়ত্তীকৃত হয়,—মনুষ্যের প্রেমডোরে পরমাত্মা আবদ্ধ হন। যে হৃদয়ে তিনি প্রকৃত প্রেম পান, প্রকৃত আদর ও সৎকার পান, সেই পরম অতিথি সেই খানেই ধরা দেন,—সেই খানেই তিনি অভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে থাকেন। তিনি ভক্তের সর্ব্বস্ব ধন হন, ভক্তও তাঁহার সর্ব্বস্ব ধন হয়। তিনি ভক্তের মধ্যে বিরাজ করেন, ভক্তও তাঁহার মধ্যে বিরাজ করে। যে পরিমাণে ভক্তের আত্ম-সমর্পণ, সেই পরিমাণে সেই ভক্ত-বৎসল তাহার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ও বিমিশ্রিত। এই অবস্থা অবাধে উন্নতির অনন্ত পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা বর্ণনাতীত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রসঙ্গ। *

ঈশ্বরপ্রসঙ্গের উপকারিতা সাধক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এক এক সময়ে আমরা বন্ধুগণের সঙ্গে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে প্রেমালাপ করিতে করিতে গভীর উপাসনার আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি, সেই অবস্থায় এই প্রেম-প্রসঙ্গে নিমগ্ন হইয়া আত্মস্মৃতি পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং অতি সুদীর্ঘ সময়কে মুহূর্ত্তের ন্যায় যাপন করিয়াছি; কোথা দিয়া যে, সময়স্রোত চলিয়া গিয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই। উপাসনার ন্যায় প্রসঙ্গেও ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়। পাঁচটী বন্ধু মিলিয়া সেই পরম বন্ধুর দয়ার ও গুণের কথা বলিতে বলিতে ও শুনিতে শুনিতে তাঁহার আবির্ভাবস্রোতে তাহাদের হৃদয়গুলি ভাসিয়া গেল,—পাঁচটী হৃদয় সেই পরমলোকে গিয়া মিলিত হইয়া একটী হৃদয় প্রস্তুত হইল,—পাঁচটী জ্বলন্ত প্রদীপ একত্র হইয়া পঞ্চপ্রদীপের শোভা ধারণ করিয়া সেই পরমারাধ্যের আরতি করিতে লাগিল। পৃথিবীতে এরূপ সুন্দর দৃশ্য অতি বিরল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মাদৃশ অধস্তন উপাসকেরা সকল সময়ে এই সুন্দর দৃশ্য আয়ত্ত করিতে সক্ষম নহে। উচ্চতম সাধু ভক্তেরাই সৎপ্রসঙ্গে মিলিত হইলে, আসর জমাইতে সর্ব্বদাই পারগ হন। প্রসঙ্গ জমান কেবল এই সকল সাধক দিগেরই সর্ব্বদা আয়ত্তাধীন।

---

* তত্ত্ব-কৌমুদী;—১৮০০ শক, ১৬ই আষাঢ়।

উপাসনা অপেক্ষা প্রসঙ্গের একটী অধিকতর উপকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তির ন্যায়, অন্তরের ভ্রাতৃভাব বিশেষরূপে সম্পোষণ লাভ করে। উপাসনা দ্বারাও ভ্রাতৃভাব পোষণ হইতে পারে, কিন্তু প্রসঙ্গ দ্বারা তাহা বিশেষ রূপে হইয়া থাকে। প্রসঙ্গ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, ভ্রাতৃভাব পোষণে কথনই অকৃতকার্য্য হয় না। যখন প্রেমে উত্তেজিত হইয়া পরস্পরের মুখে সেই প্রেমাস্পদের কথামৃত পান করিবার জন্য চিত্ত লালায়িত হয়,—যখন পরস্পরের জীবনের ইতিবৃত্তে সেই পরম দয়ালের অপূর্ব্ব লীলার কথা শ্রবণ করিবার জন্য হৃদয় উৎসুক হয়, তখন স্বর্গীয় প্রেম-প্রবাহ সেখানে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং মনের স্বার্থপরতা, কুটিলতা, মলিনতা সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ভ্রাতৃভাব পোষণের এমন সুসময় আর কোথায় মিলিবে? প্রসঙ্গ চরিত্রশোধনেরও উৎকৃষ্ট উপায়।

গভীর ধ্যান ধারণা অপেক্ষাও প্রসঙ্গের উপকারিতা অনেক অধিক। ধ্যান ধারণা দ্বারা ঈশ্বরের আবির্ভাবকে ধরিয়া রাখা অসম্ভব না হইলেও যার পর নাই কষ্টসাধ্য, কিন্তু প্রসঙ্গ দ্বারা এই আবির্ভাবকে যতক্ষণ ইচ্ছা অনায়াসে ধরিয়া রাখা যায়। বিশেষতঃ এই প্রসঙ্গ-সাধ্য আবির্ভাব ধ্যান-সাধ্য আবির্ভাব অপেক্ষা সর্ব্বাংশে সুমিষ্টতর।

প্রসঙ্গের সময় সকলেরই হৃদয় সেই প্রেমময়ের আবির্ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তখন পরস্পরের বাক্য সেই অনুপ্রাণিত হৃদয়ের গভীর স্থান হইতে নির্গত হইয়া পরস্পরের উত্তেজিত হৃদয়ের গভীর স্থান পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া প্রবিষ্ট হয়। অনুপ্রাণিত হৃদয়ের বাক্য দৈবশক্তি সম্পন্ন, তদ্দ্বারা সহজে অপর সাধারণ সকলের

অন্তরের অন্ধকার বিদূরিত হয় ও হৃদয়ের পাপ, দুষ্প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতা সঙ্কুচিত হয়। সেই শক্তিসম্পন্ন বাক্য অনুপ্রাণিত হৃদয়ে আরো আশ্চর্য্য ব্যাপার উৎপাদন করে। উত্তেজিত বাক্যের ক্রম অনুত্তেজিত হৃদয় অপেক্ষা উত্তেজিত হৃদয়ে অনেকগুণ অধিক।

এইরূপ অনুপ্রাণন্ ভিন্ন প্রসঙ্গ কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। যে প্রসঙ্গের উপরে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি না হয়, তাহা কখনই প্রসঙ্গ নামের উপযুক্ত নহে। মনের ইচ্ছাতে বা অনুরাগে কখনই প্রসঙ্গকে সুসিদ্ধ করা যায় না। স্বর্গীয় বায়ু কখন্ বহিবে, তাহা কেহই জানে না।

কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কতকগুলি শুভযোগ একত্র হইলে প্রসঙ্গ আপনা হইতে উদয় হয়। তন্মধ্যে আমরা কয়েকটি উল্লেখ করিতে পারি। যেখানে পরস্পরের উপর সরল বিশ্বাস আছে, পরস্পরের কাহারো প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ নাই, অপ্রীতিকর কোন প্রকার অসদ্ভাব নাই,—যেখানে হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাভাবিক নৈকট্য সম্বন্ধ (affinity) আছে, সেখানে প্রসঙ্গ অতি সহজে স্বর্গীয় সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন তাহার উদয় অতি বিরল। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকে প্রসঙ্গের জন্য মিলিত হইয়া, ঘোরতর তর্কবিতর্ক করিয়া অন্তরে অশান্তি ও অসদ্ভাব লইয়া গৃহে ফিরিয়া যায়।

প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রসঙ্গ স্থলে যেন কেহ বাচালতা প্রকাশ না করেন। আপনি বলিব আর সকলে শুনিবে, এরূপ ইচ্ছা দ্বারা কেহ যেন পরিচালিত না হন। ইহা অন্তরের গভীর স্বার্থপরতা হইতে উৎপন্ন হয়। প্রসঙ্গ স্থলে লোকের স্বার্থপরতা এই পথ দিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বরং বলিবার অপেক্ষা অন্যের কথা শুনিবার জন্য অধিকতর প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যকে বলিবার সম্পূর্ণ অবসর দেওয়া বিধেয়।

অন্যকে শিক্ষা দিব অপেক্ষা অন্যের কাছে শিখিব, এই ইচ্ছা যেন অন্তরে বলবতী থাকে। অন্তরের ভাব দ্বারা উত্তেজিত না হইলে, কেহ যেন কথা না কহেন। ইহা সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অনুপ্রাণিত হৃদয় হইতে কথা নিঃসৃত না হইলে, তাহা কখন কাহারও হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে না এবং সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া প্রসঙ্গকে জমাইতে পারিবে না। প্রথমে, কতক সময় আদবে কোন কথা না হওয়াই ভাল। সকলে নিস্তব্ধ হইয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিবেন, পরে অন্তরে ভাবের উত্তেজনা হইলে কথা আরম্ভ করিবেন। যখন কথা আরম্ভ হইবে, তখন সকলে যেন সেই দিকে মনোযোগ অর্পণ করেন; এবং সেই কথামৃত পান করিবার জন্য পূর্ব্বানুরাগী হন। কেহ যেন কাহারো কথাতে কোন প্রকার বাধা প্রদান না করেন।

প্রথমে কথা না জমিলেও সহসা প্রসঙ্গ ছাড়িও না। অনেক সময়ে মধ্য বা শেষভাগে প্রসঙ্গ জমিয়া থাকে। বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সহিত সে সময়ের প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সদালাপ। *

তুমি প্রেমাস্পদের নাম কেন কর?—তাঁহার অদর্শন হয় বলিয়া। অদর্শনে নাম বিনা আর কি সম্বল আছে?

সাধক নাম-সিদ্ধ হন কখন্?—যখন নাম করিবামাত্র দর্শন লাভ হয়।

সাধক নাম করেন কেন?—অনুরাগের উত্তেজনায়।

অনুরাগ কখন উত্তেজিত হয়?—বিচ্ছেদে।

ব্রহ্ম দর্শন হয় কখন্? যখন চিত্ত সংসার ও বাহ্য জগৎ অতিক্রম করিয়া উঠে।

যাঁহার একবার ব্রহ্মদর্শন হইল, তাঁহার চিত্ত কেন আবার সংসারে ফিরিয়া আইসে?—চিত্ত সংসার-পাশ ছেদন করিতে পারে নাই বলিয়া,—চিত্ত ব্রহ্মেতে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে নাই বলিয়া।

ব্রহ্মদর্শন চিরস্থায়ী হয় কখন্?—যখন সংসার-পাশ চিরদিনের জন্য ছেদন করিয়া চিত্ত তদ্গত ও তদর্পিত হয়।

ব্রহ্ম লাভ হয় কাহার?—যাঁহার চিত্ত তাঁহাতে অর্পিত হইয়াছে। যাঁহার যে পরিমাণে আত্ম-সমর্পণ, তাঁহার সেই পরিমাণে ব্রহ্মলাভ।

প্রেম হয় কখন্?—যখন তাঁহার প্রেম আসিয়া হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া লয়।

প্রেমের মূল কি?—আত্ম-বিস্মৃতি।

---

* তত্ত্ব-কৌমুদী;—১৮০০ শক, ১৬ই আষাঢ়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অচ্যুত পদ। *

ধর্ম্মার্থীর জীবনে এই অচ্যুতপদ পরম প্রার্থনীয় অবস্থা। সাধকের সমস্ত সাধন এই উদ্দেশ্যেই অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহাই প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা। ইহাই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন। জীবনের মধ্যে সাংসারিকতা ও মোহের লেশ মাত্র থাকিতে, এই পরম পদ লাভ করিবার কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। যে জীবনে সংসারের আধিপত্য আছে, সে জীবন মায়া-মোহের ক্রীড়া ভূমি। সেখানে একবার জন্ম, আবার মৃত্যু; একবার উত্থান, আবার পতন; একবার উন্নতি, আবার অবনতি; একবার পুণ্য, আবার পাপ। মায়া-মোহের ক্রীড়াস্থল এই সংসারে অবাধে ক্রমাগত উন্নতি, অবিশ্রান্ত উত্থান, নিরবচ্ছিন্ন পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু-পাশ-মুক্ত অজরামর জীবন কখনই সম্ভবপর নহে। এ সমস্ত আধ্যাত্মিক রাজ্যের স্বাভাবিক ঘটনা। যাঁহার জীবন সংসারের মায়া মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সে রাজ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারই জীবন এই সমস্ত আধ্যাত্মিক দৃশ্যের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রকৃত অচ্যুত পদ এ দেশে প্রাপ্য নহে; কিন্তু সে দেশে ইহা অতি সুলভ সামগ্রী।

অটল ধর্ম্মজীবন ব্রাহ্মের অতি প্রিয় পদার্থ। প্রবল ঝঞ্চার প্রচণ্ড বেগ প্রতি নিমেষে উগ্রতর হইয়া প্রলয়ের সংহার মূর্ত্তিতে আসিয়া ব্রাহ্ম জীবনকে আক্রমণ করিতেছে। ব্রাহ্মজীবন তদবস্থা-

* তত্ত্ব-কৌমদী;—১৮০০ শক, ১৬ই আশ্বিন।

পন্ন হইয়াও অবাত-কম্পিত দীপ-শিখার ন্যায় আপনার স্থানে অটল ভাবে সুস্থির রহিয়াছে। ইহার ন্যায় সুখদ দৃশ্য সংসারে আর কি আছে? প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন অবস্থার দাস নহে, ঘটনার স্রোতে তৃণের ন্যায় নীয়মান হইবার সামগ্রী নহে। প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন সংসারের মায়া-মোহের অতীত স্থানে বিচরণ করে। সেখানে জন্ম মৃত্যুর ক্রীড়া নাই, উত্থান পতনের অভিনয় নাই, উন্নতি অবসাদের দৃশ্য-পরিবর্ত্তন নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন অচ্যুতপদ। তাহা ক্রমাগত উন্নতিশীল, অবিশ্রান্ত উত্থানক্ষম, নিরবচ্ছিন্ন পুণ্যব্রত এবং সর্ব্বক্ষণ জন্ম-মৃত্যুপাশ-মুক্ত অজর ও অমর। প্রকৃত ব্রাহ্ম কখনও স্থানচ্যুত হন না, কখনও কক্ষ ভ্রষ্ট হন না,—তিনি অনুক্ষণ আপনার স্থানে অচ্যুতপদে দণ্ডায়মান থাকেন, অনুক্ষণ অচ্যুত ভাবে আপনার কক্ষেতে পরিভ্রমণ করেন। তিনি সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সঙ্গে মিশ্রিত হন, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করেন; কিন্তু সকল বিষয়ে আপনার স্থানে, ভাবে ও মতে সুস্থির থাকিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন।

অধিকাংশ লোকই অন্যের সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় আপন আপন অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম-জীবনের বহিরঙ্গ সকল কোথাও বা অতি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কোথাও বা অন্তরের অভ্যন্তর মধ্যে একেবারে এমন লুকাইয়া যায় যে, তাহা আর সহজে বহির্ম্মুখ হইতে চায় না। এইরূপ লোক লজ্জা নিতান্ত দুষণীয়। এরূপ জীবনে ধর্ম্ম-ভাবের স্বাভাবিক স্ফূর্তির অনেক বাধা। আমি যে ধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য আমি কাহারো নিকট কখন লজ্জিত নহি, এই

ভাবে সর্ব্বদা না থাকিলে, কাহার ধর্ম্মভাব কথন স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে না। সর্ব্বদা লজ্জা বা ভয়ের মধ্যে সঙ্কুচিত থাকিলে আমাদের ধর্ম্মভাব সেই সঙ্কুচিত ছাঁচের মধ্যে অনুক্ষণ পৃষ্ট হইয়া তাহাও অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন ব্রাহ্ম নাস্তিক দলে উদার ভাবে মিশিতে গিয়া আপনার ধর্ম্ম-জীবন ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস পর্য্যন্ত হারাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে সেই দলে মিশ্রিত হইয়া আপন আপন বিশ্বাস ও আস্তিকতা গোপন করতঃ উদারতার পরিচয় দিতেন, সেই দলের প্রকৃত অভাব উন্মোচনের চেষ্টা ও কামনা না করিয়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেন; বন্ধুতার অনুরোধে কোন দিন তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বাস করিলে, তাঁহারা যে প্রতি প্রাতঃ সন্ধ্যায় উপাসনা করেন, তাহার পরিচয় দিতে লজ্জিত হইতেন। হয়ত তাঁহাদের উপাসনা সে সময়ে স্থগিত রাখিতে হইত, নয়ত তাঁহাদের নাস্তিক বন্ধুরা জানিতে না পারে, এমন স্থানে কোন ছলে নির্জ্জন হইয়া, সংক্ষেপে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এইরূপে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইতে হইতে ক্রমে উপাসনার দায় হইতে মুক্ত হইয়া বসিয়াছেন, এবং বিশ্বাস পর্য্যন্ত শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত ব্রাহ্ম যিনি, তিনি কথনও আপনার ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের জন্য লজ্জিত হন না। তিনি যে উপাসনা করেন, তাহা তিনি কাহাকেও দেখাইতে চান না, কাহাকেও গোপন করিতে চান না। তিনি সর্ব্বত্র আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সযত্ন হন। তিনি যেখানে যাউন, যেখানে থাকুন, প্রয়োজন স্থলে, আপনার বিশ্বাস ও ভাব ব্যক্ত করেন; উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে, উপাসনার জন্য অবকাশ গ্রহণ

করেন। যাঁহারা এইরূপে সর্ব্বত্র আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহারা অবিশ্বাসী নাস্তিক দলে মিশিবার উপযুক্ত লোক নহেন। যাঁহারা নাস্তিকের সহবাসে কিয়ৎ পরিমাণে নাস্তিক হইয়া যান, পৌত্তলিকের সহবাসে কিয়ৎ পরিমাণে পৌত্তলিক ভাবে পরিচিত হন, তাঁহারা অন্য দলে মিশিবার সময় যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক হইবেন।

আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, হিন্দু সমাজের মতে কিয়ৎ পরিমাণে না চলিলে হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকর্ষণ করা যায় না। তাঁহারা ব্রাহ্মের স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দু সমাজকে আকর্ষণ করিতে চান না; কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে হিন্দুর মত হইয়া হিন্দু সমাজকে আকর্ষণ করিতে চান। ইহা সেই দলের সরল বিশ্বাস হইতে পারে; কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে মায়া মোহের আধিপত্য রহিয়াছে, এবং ইহা কিয়ৎ পরিমাণে সেই মায়া মোহের হস্তে সংসৃষ্ট হইয়াছে। যত দিন তাঁহারা এই ভাবে কার্য্য করিতে থাকেন, তত দিন ইহা নিশ্চয় যে, তাঁহারা সংসারের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া তাহার হস্তে নিয়মিত হইতেছেন। হিন্দুসমাজের ঘৃণিত হইলে, হিন্দুসমাজকে আকর্ষণ করা যায় না,—যখন তাঁহারা এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য পন্থা অবলম্বন করিতেছেন, তখন প্রথমতঃ তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন। হিন্দুসমাজের ঘৃণা হইতে অব্যাহতি লাভ করা, বা হিন্দুসমাজকে আকর্ষণ করা কাহারো জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না; আমাদের মত ও বিশ্বাস অনুসারে আমাদের সাংসারিক, পারিবারিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সংগঠন করাই আমাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। তৎপরে আমরা আপ-

নার স্থানে অচ্যুতপদে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিবাসীদিগকে সেই স্থানে আকর্ষণ করিব। যাঁহাদের এইরূপ দাঁড়াইবার স্থান নাই, তাঁহারা কাহাকে কোথায় আকর্ষণ করিয়া আনিবেন? হিন্দু সমাজের প্রবল প্রভাব যাঁহাদিগকে ব্রাহ্মের স্থানে অচ্যুত রাখিতে পারিল না, তাঁহাদিগকে সেই স্থান হইতে অনায়াসে ভ্রষ্ট করিয়া আপনার সন্নিধানে টানিয়া আনিতে কিয়ৎ পরিমাণে সক্ষম হইল; তাঁহারা যেন হিন্দুসমাজকে আকর্ষণ করিবার কথা মুখে না আনেন। সেই টানে পড়িয়া হিন্দুসমাজের দিকে ভাসিয়া যাইবার সময় তাঁহারা হিন্দুসমাজের নৈকট্য অনুভব করিয়া মনে করিতে পারেন যে, তাঁহারা হিন্দুসমাজকে আপনাদের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু বস্তুতঃ মোহের প্রভাব বশতঃ ভ্রম প্রযুক্ত সেইরূপ মনে করিতেছেন। সত্য কথা এই যে, হিন্দুসমাজ আপনার স্থানে স্থির থাকিয়া তাঁহাদিগকে কবলস্থ করিবার জন্য আপন সন্নিধানে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম-তরু আর বর্দ্ধিত হইতেছে না। হিন্দু সমাজকে সন্তুষ্ট করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। যাহাকে আকর্ষণ করিতে গেলাম, পুনঃ সংস্কার করিতে গেলাম, যদি তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করাই প্রধান কার্য্য করিয়া লইলাম, তবে আমাদের ধর্ম্ম-তরু বর্দ্ধিত হইবে কিরূপে? হিন্দু সমাজের প্রবল ছায়ার ভিতরে নবাঙ্কুরিত ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বর্দ্ধিত হইতে পারে? তাহার ঘনচ্ছায়ার নিম্নে পড়িয়া ইহার প্রাণ শুষ্ক হইতেছে।

ব্রাহ্ম যদি কাহাকেও আকর্ষণ করিতে চান, তিনি স্বস্থানে সুস্থির হইয়া চেষ্টাপর হউন। স্বস্থানে দৃঢ় না হইয়া আকর্ষণ

করিতে গেলে, আকৃষ্ট হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা। ব্রাহ্ম নাস্তিকের সঙ্গে মিশিতে পারেন, সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে সংসর্গ করিতে পারেন, তাঁহাদের সাধন প্রণালীর তত্ত্ব অবগত হইতে এবং আত্মস্থ করিতে পারেন; কিন্তু এ সমস্ত আপনার স্থানে স্থির থাকিয়া চেষ্টা করিলে লাভবান্ হইবেন, নচেৎ সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। তুমি ব্রাহ্ম-সমাজ-চূড়ামণিই হও আর যে কেউ হও, তুমি স্বস্থানে সুদৃঢ় না হইয়া পৌত্তলিক পরিবারে কন্যা সম্প্রদান করিবার জন্য যদি প্রয়াসী হও, আমরা তোমার স্বাধীন প্রয়াসের জন্য তোমাকে তত দোষ দিই না; কেন না, কন্যার ইষ্টকাম হইয়া একজন সে প্রয়াসকে অন্তরে পোষণ করিতে পারেন। আমাদের দোষ দিবার কারণ তখনই উপস্থিত হয়, যখন তুমি আপনার স্থানে সুদৃঢ় হইয়া বিবাহ দিতে কৃত সঙ্কল্প না হইয়া, ব্রাহ্মের স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াও সে প্রয়াস চরিতার্থ করিতে পশ্চাৎপর না হও। যদি তুমি প্রথমতঃ রাজবিধি সম্বন্ধে আপনার স্থান ছাড়িয়া দেও, তবে পরে একটা একটা করিয়া তোমার সকল দুর্গ ছাড়িতে থাক; যে পৌত্তলিক পরিবারের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ দিতে গেলে,—যে নিম্ন ভূমিতে সেই পৌত্তলিক পরিবার অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থানে নামিয়া গিয়া তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। সেস্থলে তোমার ব্রাহ্মোচিত অনুষ্ঠান কোথায় রক্ষা হইল? তুমি কি দেখিতেছ না, সেই বিবাহানুষ্ঠানে তোমাকে আকাশ হইতে পাতালে নামিতে হইল, অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে উপত্যকা ভূমিতে অবতরণ করিতে হইল?

ব্রাহ্ম! সম্মুখে বড় বড় পতন দেখিয়া তোমার ক্ষুদ্র প্রাণ কি কাঁপিতেছে না,—তোমার স্নায়ুমণ্ডল কি স্পন্দিত হইতেছে না?

অচ্যুতপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে, তোমার পতনের আশঙ্কা দূর হইতেছে না। তুমি পরিবর্ত্তনশীল মায়া মোহের ক্রীড়া-কানন এই সংসার হইতে প্রস্থান কর, ব্রহ্ম-চরণ ধারণ করিয়া সেই অমৃত লোকে আপনার বাসস্থান নিশ্চয় কর, ব্রহ্মের অবি-শ্রান্ত ইচ্ছাস্রোতে ভাসিয়া যাইবার চেষ্টা কর; তাহা হইলে প্রকৃত অচ্যুতপদ লাভ করিতে পারিবে, নচেৎ সংসারের মোহময় পিচ্ছল পথে থাকিয়া কতদিন পা টিপিয়া টিপিয়া সতর্ক ভাবে চলিতে পারিবে? কে জানে কোন্‌দিন স্খলিত-পদ হেতু তোমার শোচনীয় পরিণাম দৃশ্য লোকের চক্ষের সমক্ষে ধারণ করিবে? যে রাজ্যে মৃত্যু নাই, সেখানে গিয়া অমর হও,—চির জীবনের মত মৃত্যু ভয় হইতে মুক্তি লাভ কর।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভাবাঙ্গগঠন।*

আস্থাপূর্ণ নিগূঢ় ভাবের মধ্যে পরব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয়। শুদ্ধ বিশ্বাস ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। শুদ্ধ ভাবও সেইরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। শুদ্ধ বিশ্বাস শুষ্ক;—তাহা শূন্যকে শুষ্কতা দ্বারা পরিপূর্ণ করে, তন্মধ্যে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না, কেবল নীরস দৃশ্যই উপলব্ধ হয়। শুদ্ধ ভাব অন্ধ;—তাহা শূন্যকে আনন্দরসে পরিপূর্ণ করে; কিন্তু তন্মধ্যে ব্রহ্মদর্শন হয় না, কেবল কবিত্বভাবই উপলব্ধ হয়। যখন বিশ্বাস ও ভাবের মণিকাঞ্চন যোগ, তখনি ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ। এ বিশ্বাস বুদ্ধি ও যুক্তির মীমাংসা নহে; আন্তরিক ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ সেখানকার অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এ বিশ্বাস উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়। ভূয়োদর্শন সেই চমৎকার দৃশ্যকে অল্পে অল্পে ব্রহ্ম-দর্শনে পরিণত করে। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্ম দর্শন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হইতে থাকে। ভাব হইতে বিশ্বাসের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি। যাহা এক সময়ে আনন্দ-রসপূর্ণ কবিত্ব ছিল, তাহা ক্রমে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে পরিণত হইল। ভাব যত নিগূঢ় ও গভীর হইতে থাকে, ব্রহ্মস্বরূপ তত উজ্জ্বল ও ঘনীভূত হইয়া অন্তরাকাশে প্রকাশিত হইতে থাকে। যে বিশ্বাস শুদ্ধ

* তত্ত্ব-কৌমুদী;—১৮০০ শক, ১লা ফাল্গুন ও ১লা চৈত্র।

বুদ্ধির ও যুক্তির মীমাংসা,—যে ভাব শুদ্ধ কবিত্ব রসে পরিপূর্ণ, তাহা সাধকের প্রথম অবলম্বন। তাহা কদাপি উপেক্ষনীয় বা পরিত্যজ্য নহে। সেইরূপ তাহা কদাপি চিরাবলম্বন বা শেষ গতিও নহে।

উপরে যে ভাবের কথা উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা সহজে বর্ণনীয় নহে। উপাসনার সময় আমাদের অন্তরে মধ্যে মধ্যে ভাবের উদ্রেক হয়। সে ভাব কি?—আমরা গুণের পরিচয়ে তাহার এক প্রকার বর্ণনা করিতে পারি। তাহা সরস, নির্ম্মল, চমৎকার ও আনন্দপূর্ণ। তাহা হৃদয়ের কঠোরতা দূর করে, অন্তরকে কোমল ও বিনীত করে, চিত্তকে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করে, প্রাণকে পরিতৃপ্ত করে। তাহা আত্মাকে প্রেম, অনুরাগ, সদিচ্ছা ও উচ্চাশাতে ভূষিত করে,—তাহা নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও পাপকে ঘৃণা করে এবং স্বভাবতই আপন অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর আশ্রয় স্থান অন্বেষণ করে। ইহাই "ভাব,"—বর্ণনাদ্বারা এই পর্য্যন্ত ইহাকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহা প্রতীতি করিবার বিষয়, কিন্তু বর্ণনার বিষয় নহে। ইহাই যদি "ভাব" হইল, তবে এ কথা নির্ব্বিরোধে উক্ত হইতে পারে যে, "ভাব" আর কিছুই নহে, কেবল আত্মার অস্ফূর্ত্ত উচ্চ প্রকৃতির সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র—তাহার অন্তর্নিহিত নির্ম্মল স্বরূপের আভাস মাত্র।

আমরা এখন পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিব,—ব্রহ্ম দর্শন হয়, আত্মার অস্ফূর্ত্ত উচ্চ প্রকৃতির উচ্ছ্বাস মধ্যে—তাহার অন্তর্নিহিত নির্ম্মল স্বরূপের স্ফূর্ত্তি মধ্যে। আত্মজ্ঞানের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের সম্বন্ধ এই স্থানে। আত্ম-দর্শন ভিন্ন ব্রহ্ম-দর্শন হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এখন সহজ হইল। আত্মার উচ্চ প্রকৃতির সাক্ষাৎ

দর্শন ভিন্ন ব্রহ্মস্বরূপ পরিলক্ষিত হয় না। ভাব-যোগই ব্রহ্ম দর্শনের একমাত্র সাধন।

আত্মার উচ্চ প্রকৃতির উচ্ছ্বাসকে উচ্চ স্থানে রাখিলে চলিবে না, ইহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে,—ইহাকে "করতলন্যস্ত আমলক বৎ" করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন চিরস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই।

এই উচ্চ প্রকৃতির উচ্ছ্বাসকে স্থায়ীরূপে আয়ত্ত করা সহজ-সাধ্য নহে। এই গগন-বিহারিণী বিদ্যুল্লতাকে স্থির সৌদামিনী রূপে ধরিয়া রাখিবার একমাত্র উপায় আছে। সে উপায়টী সাধন। বাস্তবিক সাধন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে, চঞ্চল সৌদামিনীকে অচঞ্চল করিতে পারে। সাধনের অসাধ্য কিছুই নাই। সাধনে ভাবাঙ্গ কিরূপে সংগঠিত হয়, আমরা সাধ্যানুসারে তাহার সন্ধান বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

ক্রোধ আমাদের একটী মনোবৃত্তি। দেখা যায় ক্রোধের একটী অন্তরঙ্গ আছে, আর একটী বহিরঙ্গ আছে। ক্রোধের অন্তরঙ্গ, যাহা আমরা অন্তরে উপলব্ধি করি, তাহা অন্তরের সীমা অতিক্রম করে না। কিন্তু ক্রোধের বহিরঙ্গ অন্তর হইতে বহির্ম্মুখ হইয়া শরীরের মধ্যে স্ফূরিত হয়। সেই বহিরঙ্গ মুখ ও চক্ষুর আরক্ত বর্ণে, শিরার অভ্যন্তরস্থ রক্তের উষ্ণতাতে ও অপরাপর অঙ্গভঙ্গি দ্বারা প্রকাশিত হয়। যখন ক্রোধের বিরাম হয়, তখন অন্তর হইতে ক্রোধের অন্তরঙ্গ এবং শরীর হইতে ক্রোধের বহিরঙ্গ উভয়ই অন্তর্হিত হয়। মনোমধ্যে ক্রোধের উদ্রেকই ক্রোধের অন্তরঙ্গ। সে উদ্রেক না হইলে ক্রোধের বহিরঙ্গ শরীরে স্ফূর্ত্তি পায় না। যদি মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ ক্রোধের উদয় হইতে

থাকে, যদি কোন ব্যক্তিকে ক্রোধের ভাবে অহরহ থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহার ক্রোধের বহিরঙ্গটী সংগঠিত হইয়া যায়, এবং তাহার শরীর মধ্যে তাহা স্থায়ীরূপে প্রোথিত হইয়া থাকে। তখন ক্রোধের বাহ্য মূর্ত্তি সেই ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে মূর্ত্তিমান হইয়া থাকে। তাহার ক্রোধ তখন কথায় কথায়। লোকে তখন তাহাকে অত্যন্ত ক্রোধী বলিয়া অভিহিত করে। ক্রোধের বহিরঙ্গটী নির্ম্মিত হইলে ক্রোধ তখন আমাদের প্রকৃতির মধ্যে জিনিয়া বসিল।

এইরূপ সমস্ত ভাব ও বৃত্তির এক একটী অন্তরঙ্গ ও এক একটী বহিরঙ্গ আছে। যখন অন্তরে উপাসনার ভাবের উদয় হয়, তখন তাহার একটী বহিরঙ্গও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়। মুখমণ্ডল পূর্ণ ও উজ্জ্বল হয়, চক্ষু প্রেমাশ্রু বর্ষণ করে, হৃৎ-কোষ উদ্বেলিত হয়, শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে থাকে, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ হয় এবং অনেক স্থলে রোমাঞ্চ, জৃম্ভন, ঘর্ম্ম প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ সমূহ পরিদৃশ্যমান হয়। ভাবের গাঢ়তা অনুসারে এইরূপ নানাবিধ লক্ষণ আবির্ভূত হইবার কথা শুনা যায়। যাহা হউক, ইহা নিঃসংশয় যে, প্রেম ভক্তির কতকগুলি বাহ্য লক্ষণ আছে। অহরহঃ উপাসনার ভাবে ডুবিয়া থাকিলে, সেই সমস্ত বাহ্য লক্ষণ শরীরে বদ্ধমূল হইতে থাকে। এইরূপে উপাসনার ভাবের বহিরঙ্গ সংগঠিত হয়। যখন উপাসনার ভাবের বহিরঙ্গ মূর্ত্তিমান হইয়া শরীরের মধ্যে স্থায়ী হয়, তখন অন্তর মধ্যে সেই বহিরঙ্গ অবলম্বন করিয়া উপাসনার ভাব তাহার অন্তরঙ্গ রূপে ক্রীড়া করিতে থাকে। সাধকের যাহা অন্তরঙ্গ, পরব্রহ্মের তাহা বহিরঙ্গ। তিনি তন্মধ্যে অহরহঃ আবির্ভূত থাকেন।

প্রকৃত সাধক যিনি, তিনি অহরহঃ তাঁহার ভাবের অন্তরঙ্গের মধ্যে তাঁহার ব্রহ্মকে অহরহঃ দর্শন করেন। এই ভাবাঙ্গ সংগঠিত হইলেই সেই অধৃষ্য পুরুষ তন্মধ্যে ধৃত হন, সেই অপ্রাপ্য ধন তন্মধ্যে লব্ধ হন,—আকাশের চঞ্চলা চপলা অচঞ্চল অচপল হইয়া থাকেন।

আমাদের ঈশ্বর বহু সাধনের ধন। "সাধন বিনা সে ধন মেলে না।" কিন্তু কি রূপ সাধনে তাঁহাকে লাভ করা যায়? "উপাসনার ভাবে অহরহঃ থাক"—এই আদেশ, এই উপদেশ, এই মন্ত্র, এই সাধন। সাধনের অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল একটী বিষয়কে সাধিয়া আয়ত্ত করা। ব্রহ্মসাধক কে?—যিনি ব্রহ্মকে সাধিয়া আয়ত্তীভূত করিয়াছেন। কিন্তু উপাসনার ভাবে অহরহঃ অধিবাস করিয়া ভাবাঙ্গ সংগঠন না করিলে, কেহ প্রকৃত সাধক বা সিদ্ধ হইতে পারেন না।

এই ভাবাঙ্গ সংগঠিত হইলেই সাধনের পর্য্যাপ্তি হইল না। এই ভাবাঙ্গ পরিবর্ত্তসহ। ইহা ক্রমেই ঘনীভূত হইতে থাকে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদর্শনও ঘনীভূত হইতে থাকে। এই ভাবাঙ্গ সংগঠিত না হইলে, সাধক অচ্যুতপদ লাভ করিতে পারেন না।

ভাবের বহিরঙ্গ কোথা হইতে সংগঠিত হয়?—ভাবের অন্তরঙ্গ হইতে। ভাবের অন্তরঙ্গ কোথা হইতে সংগঠিত হয়?—ঈশ্বরের আবির্ভাব হইতে। ঈশ্বরের আবির্ভাবের আলোকে ভাবের অন্তরঙ্গ আবির্ভূত হয়। ঈশ্বরের আবির্ভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি,—সেই আবির্ভাব হইতেই তাহার পুষ্টিসাধন। ঈশ্বর যে রূপ ভাবের প্রাণ, ভাবও সেইরূপ তাহার বহিরঙ্গের প্রাণ,

ভাবের উচ্ছ্বাস হইতে সেই বহিরঙ্গের উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধন হয়। যেরূপ পরমাত্মা হইতে আত্মা, এবং আত্মার অধিষ্ঠান প্রযুক্ত শরীর সমুৎপন্ন হয় এবং সমুৎপন্ন হইয়া তিন একত্রে ও ঘনিষ্টযোগে যুক্ত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পরব্রহ্মের আবির্ভাব হইতে ভাবোচ্ছ্বাস এবং ভাবোচ্ছ্বাস হইতে ভাবের বাহ্যমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়; এবং প্রকাশিত হইয়া তিন একত্র ও ঘনিষ্ট-যোগে যুক্ত হয়। যে পরিমাণে আত্মাতে পরমাত্মার আবির্ভাব প্রকাশিত হয়, সেই পরিমাণে ভাব অন্তরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, এবং যে পরিমাণে ভাব অন্তরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, সেই পরিমাণে ভাবের বহিরঙ্গ সংগঠন সুসম্পন্ন হইতে থাকে। যখন ভাবের বহিরঙ্গের সংগঠনটী সুসিদ্ধ হয়, তখন ভাবের বিরাম নাই, অন্তর মধ্যে নিরবচ্ছেদ ভাবের তরঙ্গ ক্রীড়া করিতে থাকে, এবং সেই তরঙ্গ-ক্রীড়ার প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মাবির্ভাব তাহার অন্তর্গত হইয়া বিরাজ করিতে থাকে। যখন ভাবের এই বহিরঙ্গটী দাঁড়াইয়া গেল, এখন সেই যুক্তত্রয়ের স্বতন্ত্র থাকা ও বিচ্ছিন্ন হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

ভাবের উচ্ছ্বাস ঈশ্বরের আবির্ভাব হইতে,—এ কথায় অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত করিবে। এ সংশয় উপস্থিত হইলে কোন যুক্তি তর্কে তাহা দূর হইবার নহে। সে সংশয় দূর হয়, কেবল ভূয়োদর্শনে অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল হইলে সে সংশয় আপনা হইতেই ছেদ হইয়া যায়। ঐ সংশয় ভূয়োদর্শনের অসদ্ভাব হইতে সমুৎপন্ন হয়; সুতরাং প্রথম প্রথম তাহার উৎপত্তি অপরিহার্য্য। ভাব-বাদের পরিণাম ভাবের অভ্যন্তরে বস্তু দর্শন। ভাব-বাদ হইতে বস্তুবাদে উপনীত হইতে

কেবল সময়ের অপেক্ষা করে। বস্তুত: ঈশ্বরের আবির্ভাব ভিন্ন ভাবের উচ্ছ্বাস হয় না, আত্মার অস্ফূর্ত্ত উচ্চ প্রকৃতি প্রতিভাত হয় না। যে পদ্ম অন্ধকার গর্ত্তে মুদিত ছিল, তাহা কেন সহসা প্রস্ফুটিত হইয়া হাসিল? যাঁহার চক্ষু ফুটিয়াছে, তিনি বলিবেন যে, সেই পদ্মকে সূর্য্যকিরণ স্পর্শ করিয়াছে। জাগ্রত ভক্ত জানেন যে, তাঁহার হৃদয়পদ্ম সেই প্রেম-সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ না হইলে প্রস্ফুটিত হয় না। নিদ্রিত ভাবকে জাগাইবার আর কাহারো শক্তি নাই, আত্মার অস্ফূর্ত্ত উচ্চ প্রকৃতিকে স্ফূর্ত্তিদান করিতে আর কাহারো সাধ্য নাই।

ঈশ্বরের আবির্ভাব ভিন্ন ভাবোচ্ছ্বাস হয় না, এবং ভাবোচ্ছ্বাস ভিন্ন ভাবের বহিরঙ্গ প্রকাশ পায় না; কিন্তু ভাবের বহিরঙ্গটী সংগঠিত না হইলে, ভাব দাঁড়াইবার স্থল পায় না, এবং ব্রহ্মাবির্ভাবকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। এই বহিরঙ্গটী সংগঠন করিবার জন্য, ঈশ্বরের আবির্ভাবকে পুনঃ পুনঃ অন্তরে ধারণ করিতে হইবে। এই উচ্চ দিক হইতে সাধন আরম্ভ হইলে, অবশিষ্ট আর সকলই সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়। সেই জন্য ঈশ্বরের দিক হইতে সাধন আরম্ভ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক; তাহা হইলে অল্পে অল্পে ভাবের বহিরঙ্গটী আয়ত্ত হইয়া যায়। ঈশ্বরের আবির্ভাবকে ছাড়িয়া কোন প্রকার কৌশলে এই বহিরঙ্গটী সাধিয়া আয়ত্ত করা সম্ভবপর হইলেও তাহাতে কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। সে প্রকার বহিরঙ্গ মৃত-দেহ তুল্য, তাহাতে প্রাণ নাই, আত্মা নাই। যে বহিরঙ্গের মধ্যে ভাবের উচ্ছ্বাস নাই, ব্রহ্মের আবির্ভাব নাই। তাহা লইয়া কাহার কি লাভ হইবে? তাহাদ্বারা সংসারে প্রতারণা চলে, কিন্তু ঈশ্বর

লাভ হয় না। ঈশ্বর-সাধক, এরূপ নীচ সাধনকে হেয় জ্ঞান করেন। কিন্তু ইহা নিঃসংশয় যে, এই বহিরঙ্গটী স্থায়ীরূপে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, ভাব দাঁড়াইবার স্থল পায় না, ঈশ্বরের আবির্ভাবও স্থায়ীরূপে বদ্ধমূল হয় না।

এই ভাবাঙ্গের সংগঠনকালে ভাবের বিরোধী ভাব সকলকে অন্তরে আতিথ্যদান করিলে, সে সংগঠনে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এই সংগঠনকালে অন্তরে কাম ক্রোধাদি রিপুগণের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা হইলে এই ভাবাঙ্গ ভঙ্গ হইয়া যায়। অন্তরে যে রিপু যখন উত্তেজিত হয়, তাহার বহিরঙ্গটী সে সময়ে শরীরে প্রকাশ পায়। রিপুবিশেষ যে বহিরঙ্গ লইয়া প্রকাশিত হয়, ভাবাঙ্গের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ভাবাঙ্গ সংগঠনকালে যদি পুনঃ পুনঃ রিপু-বিশেষের উত্তেজনা হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই ভাবাঙ্গের ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। রিপুবিশেষ যে বহিরঙ্গ লইয়া দেখা দেয়, তাহা ভাবাঙ্গকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার স্থানে আসিয়া সংস্থাপিত হয়; সুতরাং তাহার সমূহ ক্ষতি হয়। এই জন্য নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে সাধকেরা রিপু-নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে সাধক যৎকালে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহার ভাবাঙ্গটী নিদ্রিত থাকে,—নষ্ট হয় না; কিন্তু এই ভাবাঙ্গকে অধিককাল নিদ্রা যাইতে দেওয়া বিধেয় নহে, তাহাতে তাহার পুষ্টিসাধনের ব্যাঘাত হয়, তাহাতে তাহাকে দুর্ব্বল ও জীর্ণ শীর্ণ করে। প্রকৃত সাধক তাহাকে সদা সর্ব্বদা জাগ্রত ও পুষ্ট করিতে থাকিবেন, তাহা হইলে ইহার সুচারু সংগঠন অতি সহজে সম্পন্ন হয়।

এই ভাবাঙ্গ একবার সংগঠিত হইয়া উঠিলে, আমাদের অন্তরস্থ রিপু সকল সাধক-হৃদয়ে আর মালিন্যসঞ্চয় করিতে পারে না। তখন কামক্রোধাদির উত্তেজনার প্রকার পরিবর্ত্ত হইয়া যায়,—রিপুগণের রিপুত্ব তিরোহিত হয়। তখন কামের কামত্ব ও ক্রোধের ক্রোধত্ব অন্তর্হিত হয়। তখন এই রিপু সকল ভাবগত হইয়া এক এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন "রিপু পরিচারিকা দল, আনন্দে মিলে সকল, অনুদিন করিবে সব সেবার আয়োজন"—এই মহাবাক্যের মর্ম্মগত নিগূঢ় তাৎপর্য্য জীবনে প্রত্যক্ষ হয়।

এই ভাবাঙ্গ সুচারু রূপে গঠিত হইলে, সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে তাহা নিয়ত জাগ্রত থাকে। তখন সাধকের সমুদায় কার্য্য, চিন্তা ও ইচ্ছা, এই ভাবাঙ্গের অন্তরতম প্রদেশ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। তখন জীবনের সমুদায় কার্য্য কোমল ও মধুর-ভাব ধারণ করে। আমরা অহরহঃ আক্ষেপ করি যে, উপাসনার সময় যে ভাব অন্তরে উদয় হয়, জীবনে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না কেন? উপাসনার সময় হৃদয় বিনীত, কোমল, নম্র ও সদ্ভাব পরিপূর্ণ, এবং উপাসনার পর হৃদয় ঠিক তাহার বিপরীত। এই বৈষম্য দেখিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা কাঁদিতে হয়। এই বৈষম্য দেখিতে দেখিতে অনেকে অবিশ্বাসের সীমাতে গিয়া উপনীত হন। উপাসনার পর যদি আবার যে সে-ই হইলাম, তবে উপাসনার প্রয়োজন কি? তাঁহারা উপাসনাকালীন উচ্চ-ভাবকে জীবনে আয়ত্ত দেখিতে না পাইয়া, তাহাকে মনের কল্পনা বা জাগ্রত-স্বপ্ন বিবেচনা করেন। সাধনে এই মনের কল্পনা ও স্বপ্ন, সত্য রূপে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু সামান্য সাধনে তাহা

হয় না। ভাবাঙ্গ সংগঠিত হইলে সাধকের বহু দুঃখের কারণ এই বৈষম্য, কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হয়। তখন তাহার সমস্ত বাহ্য ব্যবহার তাহার অন্তরস্থিত গভীর ভাবের অবিকল অনুরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়।

ভাবাঙ্গ সংগঠিত হইলে, তন্মধ্যে সমস্ত সদ্ভাব অবস্থিতি করে এবং স্থল উপস্থিত হইলে দেখা দেয়। দয়া, প্রেম, ক্ষমা, বিনয়, স্বদেশানুরাগ, অপত্যস্নেহ, দাম্পত্য প্রণয়, ভ্রাতৃ স্নেহ, গুরুজন ভক্তি প্রভৃতি যাবতীয় সদ্ভাব সেই ভাবাঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে, এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অতি সহজে হৃদয় হইতে বিগলিত হইয়া সুধাবর্ষণ করিতে থাকে, এবং যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উদয় হয়, তাহাদিগকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া অন্তর্হিত হয়। যিনি প্রকৃত সাধক, তিনি এই ভাবের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতে চান। এই ভাবের অভাব থাকিলে তিনি কার্য্য করিয়া সুখী হন না। এই ভাবের অভাব থাকিলে, শুদ্ধ বাহিরের উৎসাহে কেহ অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতে সক্ষম নহেন, করিলে অচিরাৎ দেহটী নষ্ট হয়।

ব্রাহ্মসমাজে যে দিন হইতে ভ্রাতৃভাব কথাটী প্রবিষ্ট হইয়াছে, প্রায় সেইদিন হইতেই ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে বিষম আন্দোলনে আন্দোলিত করিতেছে। এই বিসম্বাদী ব্যবহারের উৎপত্তির একমাত্র কারণ, আমাদের অন্তরে ভাবাঙ্গ গঠনের অভাব। এখন আমরা যদি কোন ভ্রাতাকে শাসন করিতে যাই, প্রকৃত ভাবে শাসন করিতে পারি না; অনুচিত কঠোরতা ও উগ্রতা আসিয়া অন্তরকে অধিকার করে। এই ভাবাঙ্গ সংগঠিত হইলে আমরা প্রেমের সহিত

শাসন করিতে পারিব, প্রেমের সহিত ভর্ৎসনা করিতে পারিব, প্রেমের সহিত প্রহার করিতে পারিব, প্রেমের সহিত সমস্ত বাহ্য ব্যবহার করিতে পারিব। মধুর ভাবে যে শাসন করা যায়, ভর্ৎসনা করা যায়, ইহা কেবল এই ভাব হইতেই সিদ্ধ হইতে পারে। মানুষ মানুষের ব্যবহারে যখন তাহার উপাস্য দেবতার মাধুর্য্যভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে, তখন তাঁহার স্বর্গীয় প্রেম ও স্নেহ তন্মধ্যে পরিপূর্ণ দেখিবে, তখন তাহার অন্তরে কোন বিসম্বাদী ভাব স্থান লাভ করিতে পারিবে না। এই ভাবাঙ্গই সংসারে প্রকৃত ভ্রাতৃ-ভাব আনয়ন করিতে পারে। শত্রুকে যে প্রেম করিবার কথা শ্রুত হওয়া যায়, তাহা এই ঘনীভূত ভাবাঙ্গ হইতেই সিদ্ধ হওয়া এক মাত্র সম্ভবপর। খৃষ্টের প্রাণ ভাবে মজিয়াছিল, তাই তিনি শত্রুদিগের জন্য প্রার্থনা করিতে পারিয়াছিলেন,—"পিতা ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা ইহাদের অপরাধ জানে না।"

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রকৃত আত্ম-দর্শন।*

মানুষ সচরাচর বহির্ব্বিষয় ও বহির্ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত। সে এই সকল বিষয় ব্যাপারের মধ্যে রুদ্ধ ও বদ্ধনেত্র হইয়া আছে। বাহিরের বিষয় সকল,—বাহিরের ঘটনা সকল তাহার দৃষ্টিকে এত দূর আকৃষ্ট ও অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, সে আপনার দিকে তাকাইবার অতি অল্পই সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হয়। এ পৃথিবীতে প্রায় মনুষ্যমাত্রকেই এই বাহ্য সংসারসম্বন্ধে জাগ্রত, কিন্তু আত্মসংসারসম্বন্ধে নিদ্রাভিভূত বলিয়া বোধ হয়। মানুষ নানা বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইতেছে, নানা তত্ত্বের আলোচনা করিতেছে, বিদ্যার চর্চ্চাতে অভিনিবিষ্ট ও বিবিধ শাস্ত্রের জল্পনাতে অর্পিত রহিয়াছে ; কিন্তু আপনার বিষয় অতি অল্পই আলোচনা করে! এ পৃথিবীতে আত্মপ্রশ্ন অতি বিরল ; এবং যাঁহাদের মধ্যে আত্মপ্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই আত্মালোচনাতে উপনীত হন, এবং যাঁহারা আত্মালোচনাতে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই প্রকৃত আত্মতত্ত্ব লাভ করেন। আত্মপ্রশ্ন উপস্থিত হইলে

---

* তত্ত্ব-কৌমুদী ;—১৮০১ শক, ১ লা পৌষ ও ১৬ই চৈত্র।

যাঁহারা আত্মালোচনাতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ নানা ভ্রান্তি ও সন্দেহবাদে উপনীত হন। ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়, লোকে বাহ্য জগতের মুখচ্ছবি অহরহঃ দর্শন করিতেছে, অথচ আপনাকে আপনি দেখিতে পায় না; এবং ইহা কি দুঃখের বিষয় নহে যে, যাঁহারা বাহ্য বিষয়ের নানা তত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ হইতেছেন, তাঁহারা আত্মতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ হইতে গিয়া নানা ভ্রান্তি ও সন্দেহ জালে জড়িত হইয়া শেষে অন্ধকার দেখিতে থাকেন। আত্ম-প্রশ্ন উপস্থিত হইলে নানা ভ্রান্তি ও নানা সন্দেহ উত্থাপিত হয় বলিয়া অনেক মহানুভব ব্যক্তি আত্মপ্রশ্ন একেবারে পরিহার পূর্ব্বক বহির্ব্বিষয় ও বহির্ব্যাপারে বদ্ধ থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন! একেত আত্মপ্রশ্ন অতি বিরল, তাহাতে আবার ইহাকে একান্ত পরিহার করিবার চেষ্টারও নিতান্ত অভাব নাই!

ইহা অবশ্য সুখের বিষয় বলিতে হইবে যে, যদিও অতি পূর্ব্ব-কাল হইতে আত্মপ্রশ্ন উদয় হইবার পথে নানা বাধা ও বিঘ্ন; কিন্তু আমাদের মধ্যে আত্মালোচনার ঐকান্তিক অভাব নাই। ইহার প্রতিকূলে নানা আপত্তি, নানা প্রলোভন ও নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও একাল পর্য্যন্ত মনুষ্য ইহার আলোচনা করিয়া আসি-য়াছে। কিন্তু এই আলোচনার ফল যতই শুভপ্রদ হউক না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, ইহাদ্বারা আত্মদর্শন লাভ হয় নাই। বিবিধ দার্শনিক মতের অস্তিত্বই ইহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। জড়বাদ, মায়াবাদ, সন্দেহবাদ প্রভৃতি বিসম্বাদী মত, সকল প্রকৃত আত্ম-দর্শনের অভাবেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। দর্শনশাস্ত্রের সমুদায় ভ্রম এই অভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিবার সুযোগ পাইতেছে না বলিয়া নানা মুনির

নানা মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইলে, এই সকল দার্শনিক মত-ভেদের তাদৃশ স্থল থাকিত না।

এই আত্মদর্শনের অভাব হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানামতের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত, তাহা হইলে পুস্তকবদ্ধ অভ্রান্ত শাস্ত্র-বিশেষ আবির্ভূত হইয়া স্বাধীন মনুষ্য জাতিকে মত-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইত না, আপনার অন্তরেই সকলে অভ্রান্তশাস্ত্র, রত্নময় জ্ঞান দেখিতে পাইত। যদি প্রকৃত আত্ম-দর্শন থাকিত, তাহা হইলে ব্যক্তি-বিশেষকে অভ্রান্ত শাস্ত্রের অভ্রান্ত ব্যবস্থাপক রূপে বরণ করিয়া তাঁহাকে স্বজাতির উপর অনুচিত কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে দেওয়া হইত না, আপনার অন্তরের মধ্যেই নিত্য বর্ত্তমান অভ্রান্ত ব্যবস্থাপক ও অভ্রান্ত নেতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারই স্বর্গীয় হস্তে আপনাপন পোতের কাণ্ডার সমর্পণ করিয়া সকলে নিশ্চিত হইতে পারিত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া সুশাসিত রাখিবার জন্য মনঃকল্পিত ক্লেশ দুঃখের কালাগ্নিময় ভয়ানক নরক বা সুরা অপ্সরা পূর্ণ অশেষ সুখপ্রদ আরামময় স্বর্গের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন হইত না, আপনার অন্তর মধ্যে বিশুদ্ধ শাসনতন্ত্রের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য-বিশেষকে মানব জীবনের পূর্ণ আদর্শ ও ঈশ্বরের বিশেষ অবতার স্বীকার করিয়া তাহাকে পূজার্চ্চনা করিবার চেষ্টা হইত না, আপনার অভ্যন্তর মধ্যে পূজার্চ্চনার প্রকৃত বিষয় সন্দর্শন করিয়া আপনার হৃদয়জাত বিমল প্রেম ভক্তি ত্বদীয় চরণে নিয়ত উপহার দিতে সমর্থ হইত। যদি প্রকৃত আত্মদর্শন থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যাত্মাকে অশীতি কোটি যোনি ভ্রমণ

করিয়া পরিক্লান্ত ও উত্যক্ত হইতে হইত না; কিন্তু অনন্ত উন্নতির সহজ ও পরিষ্কার পথ সম্মুখে দেখিয়া নির্ভয় হইতে পারিত।

প্রকৃত আত্মদর্শন দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনা দ্বা করা যায় না। দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনা একমাত্র চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজজ্ঞান ও বুদ্ধির জ্যোতিঃ আত্মার যে সমস্ত বিভাগে পতিত হয়, এই চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাহার অন্তর্গত বিষয় সকল আত্মার জ্ঞানগম্য হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজজ্ঞান ও বুদ্ধির আলোক সকল দিক্ আলোকিত করিতে পারে না; সুতরাং আত্মনিহিত অনেকানেক বিষয় মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় এই চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টির অপ্রাপ্য ও অনধিগম্য হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সহজ-জ্ঞান ও বুদ্ধি আত্মার সেই দিক্‌মাত্র আলোকিত করিতে কথঞ্চিত সমর্থ হইয়াছে,—যে দিকের সঙ্গে এই পৃথিবীর অস্থায়ী ও সাম-য়িক সম্বন্ধ। কিন্তু আত্মার যে দিক্ ঈশ্বর ও পরকালের দিকে, আমাদের সহজজ্ঞান ও বুদ্ধি সেদিকে এরূপ ক্ষীণ, মলিন ও অসম্পূর্ণ জ্যোতিঃ বিস্তার করে যে, আমাদের চৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টি সে দিকে কেবল নিবিড় কুজ্‌ঝটিকা বা অন্ধকারই দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু দার্শনিক চিন্তা ও আলোচনা আত্মার এদিক্‌কে যে একেবারে অস্পৃশ্য রাখিয়াছে, তাহা নহে; প্রত্যুত দর্শন-শাস্ত্রে ঐশ্বরিক ও পারলৌকিক আত্মতত্ত্বের ভূরি ভূরি মীমাংসা দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সেই সমস্ত মীমাংসা দেখিয়া বোধ হয় যে, মীমাংসকদিকের আদৌ প্রকৃত আত্মদর্শন হয় নাই, তদ্দ্বারা কেবল অন্ধকারকে গাঢ়তর অন্ধকার করা হইয়াছে। রাম-

প্রসাদ ঠিকই বলিয়াছেন, ""ষড়্ দর্শন অন্ধগুল, দেয় লোকের চক্ষে ধূল।" বস্তুতঃ এই সকল দার্শনিক মীমাংসা দ্বারা মানুষের আভ্যন্তরিক চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতিরিক্ত আমাদিগের প্রাচীন যোগশাস্ত্র, ও আধুনিক তন্ত্র, ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক অধ্যাত্ম-তত্ত্ব, এবং উইলিম ক্রুক্‌স্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আধ্যাত্মিক শক্তিপুঞ্জের বর্ত্তমান পরীক্ষা সকল, আত্ম-গর্ব্ভ-নিহিত যে সমস্ত অলৌকিক ও অস্ফূর্ত্তপূর্ব্ব শক্তি নিচয়ের কথা ব্যক্ত করে, যদি তন্মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকে, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের আত্মচৈতন্য বা অন্তর্দৃষ্টিমূলক দর্শনশাস্ত্র, আত্মার সে দিকের কোন সন্ধানই প্রাপ্ত হয় নাই, এবং কখনও যে প্রাপ্ত হইবে, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না।

পার্থিব সম্বন্ধ-জনিত দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা বিশেষে আত্মাতে যে সমস্ত স্থানীয়, সাময়িক, লৌকিক ও আকস্মিক ভাবান্তর বা অবস্থান্তর সংঘটিত হয়, তাহার অনুভব, চিন্তা ও আলোচনা প্রকৃত আত্মদর্শন নহে। প্রকৃত আত্মদর্শন তাহা, যাহাতে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আত্মার মধ্যে যাহা কিছু সার্ব্বভৌমিক, নিত্য, মুখ্য, তাহা এক সঙ্গে বা একত্রে প্রকাশ পায়। এরূপ আত্মদর্শন দার্শনিক চেষ্টার অতীত বিষয়। যখন মানুষের অন্তর্দৃষ্টিতে আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপ প্রকাশ পায়, অনন্তের বীজ দর্শন হয়,—পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার নিত্যযোগ, তাঁহার উপর তাহার নিরতিশয় নিত্য নির্ভর, তাঁহাতেই আত্মার নিত্য সম্বল ও নিত্য আরাম আবিষ্কৃত হয়; তাহার নিত্য কালের কামনা সকল, ভাব সকল, আশা সকল, স্ফূর্ত্তি পায়;

ইহলোক ও পরলোকের সঙ্গে তাহার প্রকৃত সম্বন্ধ উদ্বোধিত হয়, তাহার জীবনের চরমাবস্থা ও পরিণামের ছবি উদ্দীপ্ত হয়; তখনই মানুষের প্রকৃত আত্মদর্শন লাভ হয়। যেখানে প্রকৃত আত্মদর্শন, সেখানে সন্দেহ নাই, অবিশ্বাস নাই। প্রকৃত আত্মদর্শনে, জ্ঞান বিশ্বাস একত্র হয়। কেবল প্রকৃত আত্মদর্শনে কেন, যাবতীয় প্রকৃত দর্শনেই জ্ঞান ও বিশ্বাস এক হইয়া থাকে। এ বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নহে,—চাক্ষুস প্রত্যক্ষজনিত স্থায়ী ও অটল বিশ্বাস।

এই আত্মদর্শন চিন্তা ও আলোচনা বা দার্শনিক পরীক্ষার অধিগম্য নহে। ইহা সরল প্রার্থীর প্রতি ব্রহ্ম-কৃপার ফল। যখন সরল প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ ব্রহ্ম-কৃপার আলোক অন্তরে উদ্দীপ্ত হয়, তখনই আমাদের অন্তর্দৃষ্টি আত্মার অদৃষ্টপূর্ব্ব মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া চমৎকৃত হয়। প্রকৃত আত্মদর্শন, ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া প্রকাশ পায় না। কিন্তু ব্রহ্মাবির্ভাবের সঙ্গেই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। উপরের লিখিত আত্মার সমস্ত বিভাগ একেবারে স্ফূর্ত্তি পায় না। প্রথমে, সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দের ক্রোড়ে আত্মা, আপনার ক্ষুদ্র শিশুরূপ,—সেই অনন্তের গর্ভে এই অনন্তের ক্ষুদ্র বীজটী দর্শন করে, পরে আর আর সকলভাব সময়ে প্রকাশিত হয়।

যে দিন আত্মা আপনার দিকে তাকাইয়া তন্মধ্যে সেই অনন্তের বীজ প্রথম দর্শন করে, সেই দিন হইতে তাহার প্রকৃত নবজীবন আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে পার্থিবজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব সম্বন্ধ-জনিত আত্মসম্বন্ধীয় বাহ্য জ্ঞানও বিকসিত হইয়াছিল, কিন্তু যে শুভদিনে প্রকৃত

আত্মজ্ঞান বিকসিত হয়, সে দিন আত্মার পক্ষে যথার্থই নূতন জীবন। এ দিন হইতে একটী অভিনব পট আমাদের অন্তর মধ্যে খুলিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক মনুষ্যকে এই শুভ দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে; দয়াময় ঈশ্বর প্রত্যেক লোকের জন্য অবসর অন্বেষণ করিতেছেন। বাহ্যিক আত্মজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইলে দর্শন-শাস্ত্রের নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।

আত্মজ্ঞানের তিনটীমাত্র উপায় আছে, (১) সহজ-জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোক এবং অন্তর্দ্দৃষ্টি, (২) ব্রহ্মজ্যোতিঃ ও অন্তর্দ্দৃষ্টি, (৩) পরীক্ষা ও অনুসন্ধান। এই উপায়ত্রয়ের একটীও পরিত্যজ্য নহে। এই উপায়ত্রয়ের প্রথম দুইটী, অন্তর্দ্দৃষ্টি বা আত্মচৈতন্যমূলক। তৃতীয় উপায়টীর সঙ্গে সেই অন্তর্দ্দৃষ্টি বা আত্মচৈতন্যের কোন সম্বন্ধ নাই; তাহা বিজ্ঞান-মূলক অর্থাৎ প্রক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহার ফল পরীক্ষা সাপেক্ষ। প্রথম উপায়টী দ্বারা দর্শন-শাস্ত্র, দ্বিতীয় উপায়টী দ্বারা পরমার্থ তত্ত্ব, এবং তৃতীয় উপায়টীর দ্বারা আত্মগত শক্তিপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়। প্রথম উপায়টীর স্ফূর্ত্তি স্বভাবসিদ্ধ; দ্বিতীয় উপায়টীর স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা ও ব্রহ্ম-কৃপানুগত। তৃতীয় উপায়টী। স্ফূর্ত্তি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সাপেক্ষ। যেখানে মনোযোগ অন্তর্দ্দৃষ্টির অনুগত হইয়াছে, সেখানে প্রথম উপায়টী স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। এই উপায়ের স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল বিষয় জ্ঞানের অধিগম্য হয়। তখন আত্মার বহির্ব্যাপার, পটের ন্যায় তাহার অন্তর্দ্দৃষ্টির সম্মুখে খুলিতে আরম্ভ হয়। জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছার অশেষ তরঙ্গময়ী

স্রোতস্বতী বিচিত্র লীলা প্রদর্শন করিতে করিতে তাহার অন্তর্নেত্রের সম্মুখে প্রবাহিত হইতে থাক। সেই স্রোতস্বতীর অশেষ তরঙ্গরাজি যে নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিরাজিত থাকে, স্থিরচিত্তে দেখিতে দেখিতে তাহাও আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সেই স্রোতস্বতীর আভ্যন্তরিক ব্যাপার তৎকালের জ্ঞানের অনধিগম্য বা অস্পষ্ট-লব্ধ থাকে। গৃহমধ্যে যে সকল ক্ষুদ্রাণুপুঞ্জ উড্ডীয়মান থাকে, তাহা মনুষ্যের স্বাভাবিক দৃষ্টির সুলভ্য বা অধিগম্য নহে; কিন্তু যখন গবাক্ষ মধ্য দিয়া সূর্য্য স্বকীয় কিরণ-জাল গৃহাভ্যন্তরে জ্বলন্ত স্তম্ভের ন্যায় তির্য্যগ্‌ভাবে বিস্তীর্ণ করে, তখন সেই প্রসারিত কিরণস্তম্ভের সর্ব্বাঙ্গে ক্রীড়মান উদ্দীপ্ত ক্ষুদ্রাণুপুঞ্জ মনুষ্যের দৃষ্টিতে প্রকাশিত হয়। সেইরূপ আত্মার গূঢ় আভ্যন্তরিক প্রদেশ আমাদের অন্তর্দ্দৃষ্টির সমক্ষে সহজেই অপ্রকাশিত বা অস্পষ্টচিত্রিত থাকে। সহজ-জ্ঞান ও বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোক সে প্রদেশকে সম্যক্‌রূপে উদ্দীপ্ত ও আলোকিত করিতে পারে না; কিন্তু যখন ব্রহ্মজ্যোতিঃ আসিয়া সেই তমসাচ্ছন্ন প্রদেশকে উজ্জ্বলিত করে, তখনই তাহা অন্তর্দ্দৃষ্টির সম্মুখে সুপ্রকাশিত হয়। এই ব্রহ্মজ্যোতিঃ আত্মজ্ঞানের দ্বিতীয় উপায় এবং প্রকৃত আত্মদর্শনের একমাত্র উপায়। যে উপায়ে প্রকৃত আত্মদর্শন স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা প্রার্থনা ও ব্রহ্মকৃপাসাপেক্ষ। প্রার্থনা আত্মার শ্বাসত্যাগ, ব্রহ্মকৃপা আত্মার শ্বাসগ্রহণ। চিত্ত-মধ্যে এই শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিধি হইতে থাকিলে, ব্রহ্মজ্যোতিঃ আত্মার আভ্যন্তরিক বিভাগকে তৎকালে উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়। আত্মা তদ্দ্বারা আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত

ও পুলকিত হয়। আত্মজ্ঞানের তৃতীয় উপায় পরীক্ষা। এই উপায়টী সর্ব্বত্রেই অবহেলিত, উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইয়া থাকে। এই অভিশপ্ত উপায়টীর অনুকূলে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিলে, এখানে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথম উপায়টীকে যদি দার্শনিক নামে অভিধেয় করা যায়, দ্বিতীয় উপায়টীকে যদি "দৈবাধীন" অভিধানে উল্লেখ করা হয়, তবে এই তৃতীয় উপায়টী সর্ব্বতোভাবে "বৈজ্ঞানিক" উপায় নামে অভিহিত হইতে পারে। জল অতি সামান্য ও সর্ব্বত্র ব্যবহৃত পদার্থ। কতকাল পূর্ব্বে ইহা মানুষের ব্যবহারে আসিয়াছে, কতকাল পূর্ব্বে মানুষ ইহার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছে; কিন্তু এই সামান্য পদার্থের অভ্যন্তরে যে সকল আশ্চর্য্য ক্ষমতা নিহিত ছিল, তাহা এতকাল পর্য্যন্ত কেবলই পরীক্ষার অভাবে মানুষের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। পরীক্ষার অভাবে জল এতকাল তাহার মর্ম্মস্থ শক্তি ও রহস্য কাহারো নিকটে প্রকাশ করে নাই। জল কলকল রবে প্রবাহিত হইবার সময় বাষ্পাকার ধারণ করিয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইবার সময়, সকলকেই বলিয়াছে, "ওহে! আমি কেবল তোমাদের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য সৃষ্ট হই নাই, কেবল তোমাদের শস্য-ক্ষেত্রে সকল উর্ব্বর করিবার জন্য উদ্দিষ্ট হই নাই, কেবল তোমাদের নৌ-যানাদি পৃষ্ঠে বহন করিবার জন্য অবতীর্ণ হই নাই, আমার মধ্যে অসামান্য শক্তি নিহিত আছে; কে আছ, পরীক্ষক হইয়া এস, আমি তোমাদিগকে আমার মর্ম্ম রহস্য বলিয়া দিব।" উনবিংশ শতাব্দির পূর্ব্বে কেহই জলের এই কলধ্বনির এবং উত্থিত বাষ্পের এই ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম

করিতে সমর্থ হয় নাই। বাস্তবিক, বর্ত্তমান সময়ের অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে কাহারো কল্পনাতেও আসে নাই যে, সেই পুরাতন সামান্য জল বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ও ধাতু-কোষে রুদ্ধ হইয়া সহস্র সহস্র আরোহী বিশিষ্ট অর্ণবপোত বা শৃঙ্খলবদ্ধ শকটাবলী লইয়া নক্ষত্র বেগে অবিরাম গতিতে ছুটিতে পারে! এখন কে জানে যে, সেই সামান্য জলের অভ্যন্তরে ঈদৃশ আরো কত অদ্ভুত শক্তি নিহিত আছে? কে জানে জলের ন্যায় কত সামান্য ও সদা ব্যবহার্য্য পদার্থের অভ্যন্তরে কত অদ্ভুতক্ষমতা নিহিত আছে এবং আপনাদের আভ্যন্তরিক গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য সেই পদার্থ সকল সতৃষ্ণনয়নে উত্তর কালের মুখ প্রতীক্ষা করিতেছে? যদি পুরাতন সামান্য পদার্থের মধ্যে এত অদ্ভুত ক্ষমতা নিহিত থাকিতে দেখা যায়, তাহা হইলে আমাদের আত্মগর্ত্ত মধ্যে যে কত অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য রহস্য নিমজ্জিত থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

সুগভীর আত্মগর্ত্ত মধ্যে যে কোন নূতন রহস্য নিহিত থাকিতে পারে, বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক তাহার সম্ভাবনাতেও তাদৃশ আস্থা ও বিশ্বাস করেন না। এজন্য এদিকে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধান নিয়োজিত হইবার পথে তাঁহারা নানা বাধা ও বিঘ্ন স্থাপন করেন। কোন কোন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এরূপ কুসংস্কারান্ধ যে, এদিকে কোন চেষ্টা নিয়োগ করিলে, তাঁহারা সেই চেষ্টাকে কুসংস্কার ও ভ্রান্তি-প্রণোদিত বলিয়া উপহাস করেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, বৈজ্ঞানিকদিগের এ প্রকার ব্যবহার নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্তসংস্কারপ্রণোদিত। এ প্রকার ব্যবহার সত্যের অনু-

সন্ধান ও আবিষ্কার ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির পথের সম্পূর্ণ অন্তরায়।

কোন প্রস্তাব পরীক্ষার্থ উত্থাপিত হইলে, সহসা তাহাকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া, মানুষের একটী পুরাতন রোগ। যাহারা এরূপ 'অসম্ভব' বলিয়া কোন পরিমিত প্রস্তাব উড়াইয়া দেন, তাঁহাদের একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বিজ্ঞান দ্বারা সংসারে অনেক 'অসম্ভব' 'সম্ভব' হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ অসম্ভব রাজ্যকে ক্রমে ক্রমে সম্ভবে আনয়ন করাই, বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের উপর যে সাধারণের শ্রদ্ধা ও সমাদর আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল তদ্দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব হইতে দেখিয়া। বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান, অসম্ভব প্রদেশে আপনার বিজয় নিশান উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই, এই ঊনবিংশ শতাব্দীর নামে লোকের এত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আশ্চর্য্য ভাব উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কে সম্ভবপর মনে করিতে পারিয়াছিল যে, দুই ব্যক্তি পরস্পর সহস্র যোজন ব্যবধানে থাকিয়াও পরস্পরে নিকটস্থ ব্যক্তির ন্যায় কথোপকথন করিতে পারিবে? হয়ত নিউটন ও ল্যাপ্লাসের ন্যায় অগাধ-বুদ্ধি ও প্রতিভাশালী ব্যক্তির নিকটও তাহা 'অসম্ভব' বলিয়া অনায়াসেই উপেক্ষিত ও অবহেলিত হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে, অর্দ্ধ শতাব্দীও গত হয় নাই, সেই চির-সিদ্ধান্ত 'অসম্ভব,' সর্ব্বসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের মন স্বভাবতঃই চঞ্চল; এমন কি, চঞ্চলা চপলা অপেক্ষাও চঞ্চল। সে কিছুতেই আপনাকে ধরা দিতে চাহে না।

তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন, দেখিবে যে, সে সুদূরে গিয়া তোমার প্রয়াসের প্রতি উপহাস করিতেছে। তুমি তোমার প্রিয়তম ঈশ্বরকে হৃদয়াসনে রাখিয়া পূজা করিতে চাহিতেছ, কিন্তু মনের কার্য্য দেখ, তোমার প্রিয়তমকে স্বর্গ হইতে আনিয়া তোমার হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া তোমার পূজোপহার উৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে সে এমন নিঃশব্দে তথা হইতে ডুব দিয়া প্রস্থান করতঃ কোথায় গিয়া উঠিয়াছে যে, তুমি তাহার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইবে। এইরূপে তুমি যতবার তাহাকে ধরিবার চেষ্টা কর, ততবার তোমার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। বাস্তবিক কি এই চঞ্চল মনকে শাসনাধীন করিবার কোন উপায় নাই? এই মন কি চিরকাল আকাশের বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল থাকিবে? চিরকাল কি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইয়া সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবে? কেবল পরীক্ষা ও অনুসন্ধান, এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে।

যদি এতদূর গেলাম, আরো কিয়দ্দূর যাই। এই যে সম্মুখস্থ প্রাচীর, ইহাই কি চিরকাল আমার দৃষ্টিপথের প্রতিবন্ধক থাকিবে? আমার মধ্যে এমন কোন আভ্যন্তরিক শক্তি নিহিত আছে কি না, যদ্দ্বারা আমি অনায়াসে এই সম্মুখস্থ অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরালের অপর প্রান্তস্থ পদার্থ নিচয় দৃষ্টিগোচর করিতে পারি? অমানিশার গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার দৃষ্টি চলিতে পারে কি না, এবং সেই অন্ধকার সত্ত্বেও চতুঃপার্শ্বস্থ দ্রব্যরাশি উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে কি না? আমার চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ হইলে বা আমি নিমীলিত নেত্রে থাকিলে, কেবল অন্তরস্থ দৃষ্টিশক্তি বলে চক্ষুষ্মান বা উন্মীলিত-

চক্ষু ব্যক্তির ন্যায় আমার দর্শন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে কি না? যদি একজন স্থূলবুদ্ধি ও হীনপ্রতিভা লইয়া জন্মিয়া থাকেন, এমন কোন উপায় আছে কি না, যদ্দ্বারা তিনি সূক্ষ্মবুদ্ধি ও উজ্জ্বল প্রতিভাশালী হইতে পারেন?—যদি কোন ব্যক্তি দুরন্ত পাপ প্রবৃত্তি ও অতি দুর্ব্বল ধর্ম্ম প্রকৃতি লইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, কোন সাধনপ্রক্রিয়া বলে তিনি সুপ্রবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লাভ করিতে সক্ষম কি না? এমন কোন কৌশল আয়ত্ত করা যায় কি না, যাহাতে মানুষ অল্লায়াসে ও অল্প সময়ে বহুল জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন? কেবল পরীক্ষা ও অনুসন্ধান, এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দিবার জন্য অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, প্রাচীন কালের যোগীরা ও তান্ত্রিক সময়ের সাধকেরা এরূপ বহুবিধ পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছেন, এবং বর্ত্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় অধ্যাত্মতত্ত্বের বহুবিধ পরীক্ষা হইতেছে; কিন্তু তাহাতে ত কোন সুফল ফলিতে দেখা যায় নাই। একথা সত্য বলিয়া সহসা মানিয়া লইলেও, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রতিরোধ করিতে কাহারো অধিকার নাই। এক সময়ে বা এক স্থলে, কোন কারণ বশতঃ হয়ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া থাকিবে; তাই বলিয়া যে, সে চেষ্টা সর্ব্বত্র চিরকালই ব্যর্থ হইবে, ইহা সিদ্ধান্ত করা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। প্রাচীন কালের ও তান্ত্রিক সময়ের চেষ্টা যদি সত্য সত্যই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কারণস্বরূপ ইহা উল্লিখিত হইতে পারে যে, সে সময়ের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান সমবেত চেষ্টাদ্বারা সম্পন্ন হয় নাই; যিনি চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি অসহায় ও নির্জ্জন হইয়া নিভৃত কন্দর মধ্যে গিয়া চেষ্টা

করিয়াছেন, একজনের পরীক্ষার ফল ও সাধনের প্রক্রিয়া অপরে সহজে প্রাপ্ত হয় নাই; বিশেষতঃ তৎকালে এপ্রকার অনুদারভাবে এবিষয়ের পরীক্ষাদি হইয়াছে যে, তাহাতে সেই পরীক্ষাদি বৈজ্ঞানিক আকার ধারণ করিবার কোন পথই প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যাঁহারা কোন প্রক্রিয়ার বিশেষ সাধন করিলেন, তাঁহারা সহজে তাহা কাহাকেও শিখাইতে চান নাই; নিতান্ত অনুগতভাবে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও অনেক স্থলে তাঁহাদের অনুদারতা ভঙ্গ করিতে পারা যায় নাই। সে সময়ে দুই চারি জন যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ চিত্তের দুর্ভেদ্য দুর্গ মধ্যে তাহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে লইয়া পরলোকে যাত্রা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ বংশ তাহা হইতে তাদৃশ উপকার লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। এই সমস্ত অনুসন্ধানকারীরা, সাধনের প্রক্রিয়া সকল বিষদরূপে ব্যক্ত না করুন, সাধনের ফল যে আত্মগর্ভ নিহিত অদ্ভুত শক্তি পুঞ্জের স্ফূর্ত্তি, তাহা তাঁহারা তাঁহাদের লিখিত শাস্ত্রাদিতে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, নাস্তিক ও আস্তিক উভয় শ্রেণীর অনুসন্ধায়ীগণ তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক ইউরোপ, আমেরিকা হইতেও সে কথার সম্পূর্ণ সায় আসিতেছে। এই সমস্ত লিপি যে সর্ব্বাংশে অলীক, তাহা সত্যান্ধ ঘোরসংশয়ী ভিন্ন আর কাহারো সহসা অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে না; অন্ততঃ পরীক্ষার পূর্ব্বে সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কাহারো অধিকার নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, আমরা স্পর্শমণি অনুসন্ধান করিবার জন্য লোকের চিত্তবৃত্তিকে পুনরায় নিয়োগ করিতেছি।

কিন্তু যাঁহারা একথা বলিবেন, তাঁহাদের উক্তির কোন যুক্তি নাই। তাঁহারা একথা বলিয়া সর্ব্বপ্রকার নূতন পরীক্ষাকে নিরস্ত করিতে পারেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের আশঙ্কা দ্বারা পরিচালিত হইলে, বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান আবিষ্কার ও উদ্ভাবন মানুষের দ্বারা প্রতিলব্ধ হইত না। বিশেষতঃ যে বিষয়ে ভূতকাল ও বর্ত্তমান কাল, পুরাতন ও নূতন ভূভাগ সমস্বরে ফলের প্রত্যাশা প্রদান করিতেছে, অন্ততঃ সে বিষয়-সম্বন্ধে স্পর্শমণির পুরাতন যুক্তি গ্রহণীয় হইতে পারে না। বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক কোন অনুসন্ধানকেই আমরা নিষ্ফল মনে করি না। সাক্ষাৎসম্বন্ধে না হউক, অবান্তর ভাবে তাহা হইতে অনেক সুফল উৎপন্ন হয়। যদি আল্‌কিমিষ্টেরা স্পর্শমণির উদ্দেশে দ্রব্য গুণ পরীক্ষায় নিযুক্ত না হইতেন, তাহা হইলে অদ্ভুত রসায়ন বিদ্যা এত দিনে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইত কি না, সন্দেহ স্থল। কেবল তাহা নহে, বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান-রাজ্যে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়া মনুষ্য-সংসারের অশেষ কল্যা-ণের পথ প্রসারিত করিয়াছে, আল্‌কিমিষ্টদিগের অনুসন্ধিৎসা তাহারও নিদানভূত। অতএব অধ্যাত্মশক্তি পরীক্ষার্থ যে সময় ও শ্রম ব্যয়িত হইবে, তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইবার নহে। প্রত্যুত: ইহাতে মহৎ ফলোদয়ের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্থাপন; বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চ্চার প্রবর্ত্তন; এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মজীবন, প্রেম ও সদ্ভাব আনয়ন করিবার ভার গ্রহণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য বহুকালের প্রাচীন, রুগ্ন,

জীর্ণ কতিপয় হিন্দু ও খৃষ্টীয় পন্থার অনুকরণ ও প্রবর্ত্তন ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজ আর অধিক কিছু করিতে অদ্যাপি সমর্থ হন নাই। এই সমস্ত পন্থা ভারতবর্ষে বহুযুগ এবং খৃষ্টিয় জগতে অষ্টাদশ শত বর্ষ ব্যাপিয়া সাধিত হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা যে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজ গতানুগতিকের ন্যায় সেই পুরাতন পন্থায় চলিলে, তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্যের অতি অল্পই সুসিদ্ধ করিতে পারিবেন। পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের নূতন ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসাজের কিয়দংশ চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া বিধেয়। যদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু ও খৃষ্টীয়সমাজ অপেক্ষা কিছু নূতন ও অধিক করিতে চান, তাহা হইলে নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হউন, নূতন ক্ষেত্রে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান নিয়োগ করুন। পুরাতন মন্ত্রের সাধনে, পুরাতন ক্ষেত্র চারণে, পুরাতন ফলই প্রসব করিবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ।*

ব্রহ্মকে লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রহ্মকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ। ধর্ম্ম আর কিছুই নহে, শুদ্ধ মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাব ও অবস্থিতি। যে দিন মানুষের মধ্যে ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ হয়, সেই দিনই তাহার ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে সে প্রাকৃত মনুষ্য; তাহার সহস্র গুণ সত্ত্বেও সে প্রাকৃত মনুষ্য, ধার্ম্মিক নহে। সেই দিন হইতেই সে ধার্ম্মিক, যে দিন হইতে তাহার মধ্যে পরব্রহ্মের পবিত্র তেজ স্বপ্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। প্রাকৃত মনুষ্যের মধ্যে ব্রহ্মের পবিত্র তেজ অপ্রকট থাকে, মায়ার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত থাকে; অপ্রাকৃত মনুষ্যের মধ্যে সেই পবিত্র তেজ প্রকট হয়, মায়ার দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া অভিব্যক্ত হয়। প্রকৃত ধার্ম্মিক মনুষ্যই অপ্রাকৃত মনুষ্য। কেননা, ধার্ম্মিক মনুষ্যই ব্রহ্মস্ফূর্ত্তিমান। যদি জিজ্ঞাসা কর, কবে ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে?—আমরা তাহার প্রত্যুত্তরে এই বলিব, যে দিন হইতে ব্রহ্ম মানুষের মধ্যে প্রকটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম অপ্রকটিত ছিল, তৎপূর্ব্বে প্রাকৃত ভাবই রাজত্ব করিতেছিল।

---

* তত্ত্ব-কৌমুদী;—১৮০৪ শক, ১লা শ্রাবণ।

সেই ব্রহ্মকে লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ। যে সমাজের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাব নাই, স্ফূর্ত্তি নাই, তাহা প্রাকৃত সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ নহে। প্রাকৃত সমাজ মধ্যে ব্রহ্ম অপ্রকট, মায়ার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত। যেথানে ব্রহ্মের পবিত্র তেজ প্রকটিত হইয়াছে, মায়ার দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে, তাহাই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ। প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, পুণ্য স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, তাঁহার বিবিধ শক্তি মনুষ্যের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া দেহ ধারণ করিতে থাকে। প্রকৃত ব্রাহ্ম-সমাজে ঈশ্বর জীবন্ত ও জাগ্রত ভাবে বর্ত্তমান। প্রকৃত ব্রাহ্ম-সমাজ ব্রহ্মের দেহ স্বরূপ; তিনি তন্মধ্যে প্রাণরূপে অধিষ্ঠিত। সেই দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্রহ্মাগ্নিতে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃত সমাজ মোহ নিদ্রাতে অভিভূত, ব্রহ্মস্ফূর্ত্তি হীন, শুদ্ধ মায়িক চৈতন্যে সে চেতনাবান। মায়িক স্বার্থই সে সমাজকে সংগঠন করে, মায়িক স্বার্থই সে সমাজকে সংরক্ষণ করে, মায়িক স্বার্থই সে সমাজকে ভঙ্গ করিয়া পুনর্গঠন করে, মায়াই সে সমা-জের প্রাণ,—সেই মায়াকে লইয়াই সেই সমাজ দেহ ধারণ করি-য়াছে। সেথানে ব্রহ্মকে খুঁজিয়া পাইবে না। সেথানে তাঁহার বিশুদ্ধ সত্তা অপ্রকট।

প্রকৃত ব্রাহ্ম সমাজে, যেথানে ব্রহ্ম-স্বরূপ স্বপ্রকাশ, সেথানেই আমরা কেবল প্রকৃত ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি প্রত্যাশা করিতে পারি। সেই স্ফূর্ত্তি ত্রিবিধ নিদর্শনে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। তাহা আমরা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, সেথানে ব্রহ্মের আকর্ষণী শক্তি স্বপ্রকাশ থাকে। দূরাদূর হইতে লোকে সেই সমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়। সংসার-

পীড়িত, আশ্রম-পীড়িত সমস্ত লোকে সেই আশ্রয়ে আসিবার জন্য উন্মুখ হয়। সকলেই আশা করে, সেই স্থানে তাহাদের তাপিত প্রাণ শীতল হইবে, তাহাদের শোকার্ত্ত হৃদয় সান্ত্বনা পাইবে, তাহাদের পঙ্কিল প্রাণ বিধৌত হইবে;—সেই স্থানে তাহারা ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল লাভ করিবে। মার্ত্তণ্ড-পীড়িত পথশ্রান্ত পথিক, দূর হইতে ঘনচ্ছায়া বিশিষ্ট বৃক্ষবাটিকা সন্দর্শন করিয়া যেরূপ প্রলুব্ধ হয়, তাহা হইতে শতগুণ বলবত্তর আকর্ষণে সংসার পথের পথশ্রান্ত দীপ্তশিরা পথিক প্রকৃত ধর্ম্ম সমাজের দিকে আকৃষ্ট হয়। পরব্রহ্মে সর্ব্বাকর্ষণ শক্তি বিরাজমান, সমস্ত স্থাবর জঙ্গম তাঁহার দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। সেই সর্ব্বাকর্ষণ শক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া অভিব্যক্ত হয়, এবং আপনার কার্য্য করিতে থাকে। যে সমাজে নিত্য নূতন লোকের সমাগম নাই, সে সমাজ হইতে ব্রহ্মের এই মহীয়সী শক্তি তিরোহিত হইয়াছে,—সে সমাজের প্রাণে আঘাত পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত ধর্ম্মসমাজে ব্রহ্মের সংরক্ষিণী বা পালনী শক্তি বিবিধ আকার ধারণ করিয়া স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। যে সমাজের কেবল আকর্ষণী শক্তি আছে, কিন্তু এই সংরক্ষিণী শক্তি নাই,—যে সমাজে কেবল লোক সমাগত হইয়াই চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; যাহারা সেখানে আকৃষ্ট হইয়া আইসে, তাহাদের সেখানে অভ্যর্থনা নাই, তাহাদিগকে সেখানে বসিবার আসন দেওয়া নাই,—কেবল চতুর্দ্দিক হইতে উৎপীড়নের স্রোত, বিবাদ বিসম্বাদের স্রোত, অশান্তির স্রোত আসিয়া তাহাদিগকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করে, সে সমাজ প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ নহে। সে সমাজ প্রলয়-প্লবণ এবং শীঘ্রই কাল-সমুদ্রের প্রবল স্রোতে

কোথায় চলিয়া যাইবে। প্রকৃত ব্রাহ্ম-সমাজে ব্রহ্মের পালনী শক্তি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমগ্র সমাজের প্রতিপালনে নিয়োজিত, অতি সতর্কতার সহিত আকৃষ্ট লোক-প্রবাহকে সমাজ-বক্ষে ধারণ করিবার জন্য বিশেষরূপে সচেষ্ট, লোক-ভঙ্গ নিবারণ করিবার জন্য যার-পর-নাই প্রযত্নবান। যে ভাবে এই শক্তি সমাজ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে।

(ক) এখানে ঈশ্বরের প্রীতি-শক্তি আবির্ভূত, এই শক্তি সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে আবির্ভূত হইয়া পরস্পরকে পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করে। ঈশ্বর এখানে অমিয়ময় হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান; এখানে পরস্পর পরস্পরকে অতি কমনীয় দেখিয়া অতি গভীর আনন্দে পূর্ণ হয়; এখানে পরস্পর পরস্পরের মুখশ্রীতে, আলাপে, ব্যবহারে ঈশ্বর-প্রেমের প্রত্যক্ষ নিদর্শন দর্শন করিয়া, ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়।

(খ) এখানে ঈশ্বরের প্রেম-ভক্তি-সঞ্চারিণী শক্তি আবির্ভূত, অর্থাৎ অনেকগুলি ব্যক্তির মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, সমস্ত সমাজকে প্রেম ও ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিতে থাকে; এখানে যাঁহারা প্রেম লাভ করিবার জন্য আসেন,—ভক্তি লাভ করিবার জন্য আসেন, তাঁহাদিগকে শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে হয় না। ঈশ্বর এই সমাজ মধ্যে সাক্ষাৎ গুরুর ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া শুষ্ক মরুভূমিকে জলপ্লাবিত করেন, শুষ্ক তরুকে মঞ্জরিত করেন, পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত করেন। ঈশ্বরের যে শক্তি প্রাণের মধ্যে প্রেমের প্রস্রবণ প্রমুক্ত করিয়া প্রেমের বন্যা আনিয়া দিতে পারে, যে শক্তি হিমালয়ের পাষাণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, পতিতপাবনী ভক্তির গঙ্গাস্রোত

নির্গত করিতে পারে, সেই শক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজে দেহ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা আবির্ভূত থাকে।

(গ) এখানে ঈশ্বরের পতিতপাবনী শক্তি সাক্ষাৎ অবতীর্ণ, অর্থাৎ অনেকগুলি ব্যক্তির মধ্যে প্রকটিত হইয়া সংসারের পাপ তাপ দূর করিতে থাকে। যাহারা পাপ-রোগে রোগাক্রান্ত হইয়া, মোহ-বিকারে হতচেতন হইয়া, এই সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সমাজ তদায়ত্ত ব্রহ্মের পতিতপাবনী শক্তির দ্বারা তাঁহাদিগকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া আপনার শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া থাকেন। সমাজ মধ্যে ব্রহ্মের পবিত্রতার অগ্নি এরূপ ভাবে প্রজ্জ্বলিত যে, রাশি রাশি পাপ তাহার সংস্পর্শে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

(ঘ) এখানে ঈশ্বরের পাপ-নিবারিণী শক্তি সাক্ষাৎ অবতীর্ণ, অর্থাৎ অনেকগুলি লোকের মধ্যে মূর্ত্তিমান হইয়া কার্য্য করিতেছে। এই সমাজে প্রবেশ করিয়া লোকের পাপ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। পাপের এখানে প্রশ্রয় নাই, পাপের এখানে বন্ধু নাই, পাপের এখানে দাঁড়াইবার স্থল নাই। পাপের প্রতি ঈশ্বরের যে বিরাগ, তাহা এখানে দেহ ধারণ করিয়া প্রকটিত হইয়াছে।

(ঙ) এখানে ঈশ্বরের উন্নতি-বিধায়িনী শক্তি প্রকট। তিনি এই সমাজের আশ্রিত সমস্ত লোককে উন্নতির পথে লইয়া চলিয়াছেন। জ্ঞানে, ধর্ম্মে, প্রেমে ও পুণ্যে সকলেই দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। এখানে সকলকেই অগ্রসর হইতে দেখা যায়, কিন্তু কাহাকেও পশ্চাৎপদ হইতে হয় না। এখানে আসিলে লোকে উন্নতির স্রোতে পড়িয়া থাকেন। এ সমাজে আসিয়া লোকের একস্থানে দণ্ডায়মান থাকা অসম্ভব।

(চ) এখানে ঈশ্বরের সহস্রমুখী দয়া সাক্ষাৎ অবতীর্ণ, অর্থাৎ বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছে। ঈশ্বর দরিদ্রের বন্ধু, স্ত্রীজাতির বন্ধু বিধবার বন্ধু, অনাথ সন্তানের বন্ধু, রোগীদিগের বন্ধু, অন্ধ আতুরদিগের বন্ধু, পতিতা অবলাদিগের বন্ধু, কারাগারের অবরুদ্ধদিগের বন্ধু, মদ্যপদিগের বন্ধু, পাপীতাপীদিগের বন্ধু, তাহা এখানে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইবে। এই সমাজ মধ্যে সকল শ্রেণীর বিপন্ন ও পতিত নরনারীর রক্ষা ও উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদাই নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে।

তৃতীয়তঃ, প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মের অসার-বর্জ্জনী বা সংহার-কারিণী শক্তি সাক্ষাৎ অবতীর্ণ। সমাজের যে সমস্ত লোক, গূঢ় পাপ পোষণ করিবে, পাপের অভ্যাস সমূহ গোপন করিয়া রাখিবে, উন্নতির স্রোত হইতে আপনাকে দূরে রাখিবে, সংসার লীলায় অভিভূত হইয়া থাকিবে, তাহারা এই শক্তির বলে এখানে তিষ্ঠিতে পারিবে না ; আপনা হইতে অপসৃত হইবে। এখানে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মের সম্মান ;—অর্থ এখানে সম্মানিত হয় না এবং মনের অভিমত উচ্চপদ লাভ করিতে পারে না। এখানে ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তিমানদিগেরই আদর ও উচ্চপদ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভয়, জ্ঞান ও ভক্তি।*

প্রকৃত ভক্তি যাহা, প্রকৃত জ্ঞানও তাহা,—"True love is true wisdom" (Lord Lytton). শাস্ত্রাদিতে প্রকৃত ভক্তিকে 'অহেতুকী ভক্তি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই অহেতুকী ভক্তিতে প্রকৃত জ্ঞান ও ভক্তি—এক দেহ, এক প্রাণ, এক আত্মা। হেতুকী ভক্তিতে জ্ঞান ও ভক্তির সেরূপ একাত্মতা নাই। এই হেতুকীভক্তি দ্বিবিধ;—ভয়-মূলা আর জ্ঞানমূলা। এই ভয়-মূলা হেতুকী ভক্তি সচরাচর ভক্তিনামে অভিহিত হইলেও, তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে।

ইহার মধ্যে এই ভয়-মূলা ভক্তি অবশ্যই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ভয়ই এই ভক্তির প্রবর্ত্তক। এই ভক্তি ভয় প্রযুক্তই ধর্ম্মানুগত,—ঈশ্বরানুগত হইয়া থাকে। অনেক স্ত্রী ভয়-প্রেরিতা হইয়া দাম্পত্যব্রত পালন করেন, এবং স্বামীর অনুগত থাকেন। এখানে তুমি তাঁহাকে ভয় কর বলিয়া কাযে কাযেই ভক্তি করিয়া থাক। লোকে সচরাচর ইহাকেই ভক্তি বলিয়া থাকে। দণ্ড-ভয়, পরকালের ভয়, কর্ম্মফল ভোগের ভয়, মৃত্যুভয়, এবং অন্যান্য ভয়, এই ভক্তিকে উজ্জীবিত রাখিয়া থাকে। ঈশ্বর পাপের শাস্তা,

---

* আশা;—১৮১৪ শক, বৈশাখ।

দুষ্কর্ম্মের দণ্ডদাতা, কর্ম্মানুসারে ফলাফলের বিধাতা, এইরূপ সংস্কার অন্তরে বদ্ধমূল থাকাতেই, এই ভক্তির আধিপত্য মনুষ্য-সমাজে বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেকের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার, স্বকল্পিত ভীষণ ভাব আরোপ করতঃ দেব-চরিত্র চিত্রিত করিয়া ভয়ে পূজানুরাগী হয়। এখানেও ভয় ভক্তির প্রবর্ত্তক হইয়া আছে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বত্র এই সমস্ত সংস্কার শিথিল হইয়া পড়িতেছে; সুতরাং এই সমস্ত সংস্কার-মূলা ভক্তিও সেই সঙ্গে শিথিল হইয়া উঠিতেছে এবং অনেক স্থলে তাহার অসদ্ভাবও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইজন্য লোকে এক্ষণে ভক্তির হীনাবস্থা ভাবিয়া সচরাচর আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞান ও শিক্ষার প্রাদুর্ভাবে শাস্ত্র-চিত্রিত ঈশ্বর ও তাঁহার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিষেধ বিধি আর সে ভাবে আমাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না; সুতরাং এই ভয়-মূলা ভক্তিও আর সে ভাবে আমাদের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিতেছে না।

শিক্ষা প্রভাবে এক্ষণে এদেশে জ্ঞান ও বিজ্ঞান ক্রমশ বিস্তার লাভ করিতেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ভয়-মূলা ভক্তিও পরিবর্ত্তিত হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ, ও তাঁহার নিষেধ বিধি সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বসংস্কার কিয়ৎ পরিমাণে অন্যবিধ আকার পরিগ্রহ করিতেছে। আমাদের পূর্ব্বসংস্কার-জাত ভয়ের অঙ্গে জ্ঞানের ভাব আসিয়া মিশিতেছে। ভয়ের পুরাতন ভিত্তিস্থল এক্ষণে জ্ঞানের হস্তে জীর্ণ-সংস্কার প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং ভয়-মূলা পুরাতনী ভক্তি এক্ষণে এক প্রকার নিম্ন শ্রেণীর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আকারে পরিণত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এখানে এক্ষণে অনেকের মধ্যে এই

ভয়মূলা ভক্তির স্থলে এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কয়েক জনের মধ্যে তাহা প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং অতি অল্প লোকে তাহাকে অতিক্রম পর্য্যন্তও করিয়া থাকিবেন। এখনকার অন্যান্য শিক্ষিত-সমাজের উপরেও এই জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির ক্রম অনেকের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে। এই উভয় বিধ বিরোধী ভাবের পরস্পর সংঘটনায় কিন্তু ভক্তির মূলভিত্তি পর্য্যন্তও অনেক স্থলে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, অনেক স্থলে তাহা ভঙ্গ হইয়াও যাইতেছে; কোথাও গঠন তাদৃশ সুদৃঢ় হইতে দেখা যাইতেছে না। সুতরাং সমস্ত শিক্ষিত সমাজের ভিত্তিমূল এক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য খৃষ্টীয় সমাজের আদর্শে অথবা বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় সেই সমাজকে তাদৃশ সুদৃঢ় ও সুস্থির রাখিতে সমর্থ হইতেছে না। এই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে পূর্ব্ব-সংস্কার-জাত ভয়ের সঙ্গে গ্রন্থলব্ধ অথবা অন্য উপায়ে উপার্জ্জিত জ্ঞান মিলিত হইয়া কার্য্য করে। এখানে কোথাও বা ভয় জ্ঞানকে, কোথাও বা জ্ঞান ভয়কে শাসনে রাখিয়া কার্য্য করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিতা হইলেও অপেক্ষাকৃত শিথিল-মূলা ও চঞ্চলা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জ্ঞানমূলা হেতুকী ভক্তি অপেক্ষাকৃত উচ্চতর শ্রেণীর বলিয়া গণনীয় হইলেও, তাহাও প্রকৃত ভক্তি নহে। তোমার অদ্ভুদ গুণ-গ্রাম দেখিয়া বা শুনিয়া, তোমার মহৎকার্য্য সকল আলোচনা করিয়া বা তোমার সঙ্গে প্রচুর কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধ আছে স্মরণ বা চিন্তা করিয়া, এই জ্ঞান-মূলা হেতুকী ভক্তি মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকে। এখানে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ভয়কে অতিক্রম করিয়া

অমিশ্রিত বেশে দাঁড়াইয়াছে। ইহা সচরাচর wonder হইতে, অথবা admiration হইতে কিম্বা ভক্তি-ভাজনের গুণাবলীর অথবা তৎকৃত উপকার-রাশির স্মরণ বা মনন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জ্ঞানীগণ—কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত এবং অন্যান্য অনেকে—ইহাকে প্রকৃত ভক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। পণ্ডিতবর হার্ব্বার্ট স্পেন্সর একস্থলে, বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর ও অবিশ্রান্ত আলোচনা দ্বারা এই ভক্তিকে উজ্জীবিত রাখিতে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাই প্রকৃত ঈশ্বর-পূজা। অসীম সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য্যময় বিজ্ঞানতত্ত্বের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া এই পূজা সম্পাদন করিতে হয়। অনেকে ঈশ্বরের অনন্তশক্তি, বিচিত্র জ্ঞান, অপার করুণা ও অজস্র দয়ার কার্য্য সকল আলোচনা করিয়া বিস্ময় বা কৃতজ্ঞতা ভরে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের গুণাবলীর পুনঃ পুনঃ স্মরণ ও মনন, তাহাদের এই বৈজ্ঞানিক বা জ্ঞানমূলা ভক্তিকে উদ্দীপ্ত রাখিয়া থাকে। ইহা জ্ঞানিগণের বা বৈজ্ঞানিকগণের ভক্তিহইলেও ভক্তি নামে প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। পুনঃ পুনঃ স্মরণ ও মনন বা আরাধনা দ্বারা কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে জাগ্রত না রাখিলে ভক্তির ভাব রক্ষা করিতে পারা যায় না। এ ভক্তি স্ত্রীর কর্ত্তব্য-জ্ঞানে স্বামীকে ভালবাসার ন্যায়। বহুকাল স্বামীকে দেখিয়া শুনিয়া ও পরীক্ষা করিয়া, স্ত্রীর পূর্ব্ব ভয় চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার পরিজ্ঞাত চরিত্র, তাঁহার সুপরিচিত গুণাবলী, তাঁহার সকল সময়ের ব্যবহারের মিষ্টতা ও কমনীয়তা হইতে স্ত্রীর অন্তরে জ্ঞানমূলা ভক্তি ও ভালবাসার সঞ্চার হইয়া তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞানকে জাগ্রত করিয়াছে, এবং তাঁহাকে স্বামীর অনুরাগিনী করিয়াছে।

এখানে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে যে, প্রকৃত ভক্তি কোন অবস্থাতেই ভক্তি-ভাজনের গুণগ্রামের সংবাদ আদৌ লয়েন না, তাঁহার সদ্গুণ সকল আলোচনা করিয়া সুখাস্বাদন করেন না, তাঁহার-কৃত উপকার সকল স্মরণ করিয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে পুলকিত হয়েন না। কিন্তু এরূপ স্থলে প্রকৃত ভক্তিও কথঞ্চিৎ সমলা হইয়াছে। এখানে তাহা wonder বা admiration বা কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি ভাবের সঙ্গে মিশিয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ-শ্রেণীর জ্ঞান-মিশ্র ভক্তির আকার ধারণ করিয়াছে। এই উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির এবং অহেতুকী নির্ম্মলা ভক্তির,—উভয়ের আস্বাদন অনেক বিভিন্ন। এইজন্য ভক্তি-শাস্ত্রে এরূপ ভগবদ্ভক্তি অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই "ঐশ্বর্য্য-মিশ্রিত-প্রেমে নাহি মোর প্রীতি।" সুতরাং ভয়মূলা, অথবা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জ্ঞান-মিশ্রা, বা জ্ঞান-মূলা ভক্তিতে তাঁহার অনুরাগ যে অনেক কম অবশ্যই হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সাংসারিক ভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্বামী তাহার স্ত্রীর স্বতঃ-স্ফূর্ত্তি-বিশিষ্টা অকামোৎপন্না অপরিজ্ঞাত-কারণ-সম্ভূতা প্রীতিতে যতটা পরিতৃপ্ত হয়েন, ততটা আর কিছুতেই হন না। ভয়ানুরাগিনী ভক্তিতে কাহারও তৃপ্তি নাই। জ্ঞানানুরাগিনী ভক্তিতেও কাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি নাই। কেবল অহেতুকী ভক্তিতে ভক্ত-ও ভক্তিপাত্র উভয়েরই পূর্ণতৃপ্তি। সে ভক্তি যে বিমল অপরিজ্ঞাত মূল হইতে উচ্ছ্বাসিত হয়, তাহা বিমল আনন্দধাম; তাহা উভয়কেই সুনির্ম্মল সুখে পরিপূর্ণ করে। যাঁহারা প্রকৃত পরাভক্তি লাভ করিয়াছেন, কেবল তাঁহাদেরই এই দুর্ল্লভ উচ্চতর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির আস্বাদন লাভ হইয়া থাকে ইহা মনোনীত, বস্তুর মনোমধ্যে

অবতীর্ণ হওয়া, ইহাঁ প্রকৃত পরাভক্তির সুবিমল উচ্ছ্বাস; জ্ঞানমূলা ভক্তির কোন উচ্চতর অবস্থা নহে। স্বোপার্জ্জিত বা শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানকে সঙ্গে লইয়া এই উচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত হয়। wonder বা admiration বা কৃতজ্ঞতা বা গুণারাধনা এই উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির কারণ নহে, তবে সঙ্গের সঙ্গীমাত্র।

জ্ঞানমূলা হেতুকী-ভক্তি সুশিক্ষিত লোকের মার্জ্জিত হৃদয়েই সচরাচর স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা কোন জ্ঞামূলক হেতু বিশেষকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায় এবং সেই হেতুর অন্তর্দ্ধানে ইহার জীবন শুষ্ক হইয়া যায়। এই জন্য এই জ্ঞানমূলা হেতুকী ভক্তির প্রকৃতি সর্ব্বদাই চঞ্চল ও স্বভাবতই পরিবর্ত্তন-শীল। আজ যে সমস্ত কার্য্য ও গুণ দেখিয়া আমার wonder বা admiration বা শ্রদ্ধা অন্তরে উদিত হইল, সময়ে তাহা আর আমাকে বিমুগ্ধ করিতে পারে না; সুতরাং আমার সেই ভক্তি শুষ্কমূল ও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। আজ আমি তোমার যে সমস্ত গুণে আকৃষ্ট হইয়া অন্তরে পূজা করি, কিছুদিন পরে সেই সমস্ত গুণে আর তেমন করিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং আমার মানসিক পূজা বজায় রাখা আমার পক্ষে সুদুষ্কর, এমন কি অসম্ভব হইয়া উঠে। এক সময়ের সরস পূজা সময়ান্তরে নীরস ও কষ্টকর চিন্তামাত্র হইয়া পড়ে। আজ আমি তোমার উপকার রাশি স্মরণ করিয়া "এতদয়া পিতা তোমায়" বলিয়া কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হই, কাল সে স্মৃতিতে সে ভাব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; পুনঃ পুনঃ স্মরণেও মনের শুষ্কতা দূর হয় না। আজ তুমি আমার নব নব আকাঙ্ক্ষা সকল চরিতার্থ করিতেছ, নূতন নূতন দৃশ্যের পট আমার দৃষ্টিপথে উন্মোচন

করিয়া আমাকে চমকিত ও পুলকিত করিতেছ, নব নব অদ্ভুত শক্তি আমার অন্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া আমাকে আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত করিতেছে, তোমার নব নব স্নেহের কলিকা ফুটাইয়া আমাকে আদর করিতেছ, সময়ে এই সমস্ত দৃশ্যাবলী দৃষ্টি-পথের অগোচর হইবেই হইবে;—আর আমার এই জ্ঞান-মূলা ভক্তি অতীতের ব্যাপারে পরিণত হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে, তাহার চিহ্নমাত্রও ধরিয়া রাখিতে আমার সাধ্য হইবে না, কেবল আমার অতীত স্মৃতির গর্ভ হইতে তাহার শুষ্ক শবমূর্ত্তি সময় সময় উত্থিত হইয়া আমাকে শোকাকুল করিবে মাত্র।

বিশেষতঃ এই ভয়-মূলা, জ্ঞানমূলা হেতুকী ভক্তিতে লোকের অন্তর নির্ম্মল হইতে পারে না। আমি যদি কোন চোরকে স্বকীয় কার্য্য, শক্তি বা গুণ দ্বারা আশ্চর্য্যান্বিত, বিমোহিত বা ভয়াক্রান্ত করিতে পারি, তবে চোরও সেই ভাবে আকৃষ্ট হইয়া আমাকে এক প্রকার শ্রদ্ধা, ভক্তি বা ভয় করিবে, এবং সর্ব্বত্র আমার যশোঘোষণা ও মহিমা কীর্ত্তন করিবে; কিন্তু এই পর্য্যন্তই শেষ; তদ্দ্বারা তাহার অন্তর নির্ম্মল হইবে না। যে ভক্তি অলৌকিক গুণ বা কার্য্যের (Miracles এর) উপর প্রতিষ্ঠিত, পরিণামে নিশ্চয়ই তাহার এই দুর্গতি ও দুর্দ্দশা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই জন্যই Miracles দিগকে weak points of a revealed religion বলিয়া কেহ কেহ উক্ত করিয়াছেন। এই ভক্তি অচঞ্চল ভাবে যাবজ্জীবন স্থায়ী হওয়া কদাপি সম্ভবপর হইলেও, তাহাতে কাহারও চিত্ত-শুদ্ধি হইবে না। তাহা হইতে কাহারও স্থির-বিশ্বাস ও সংশয়রহিত বুদ্ধি উদয় হইবে না,—ভগবদ্বিধানের—ভগবদিচ্ছার স্রোতে অবিচারে অঙ্গ ঢালিবার

কাহারও শক্তি হইবে না, তাঁহার সন্নিকর্ষ-জ্ঞান তাহার নিকট মতবদ্ধ হইয়া থাকিবে, তদ্দ্বারা তাহাকে নির্ভয় করিতে পারিবে না; তৎকালে তোমার ও আমার ন্যায় অপদার্থ তাহার সন্নিকটে থাকিলে বরং তাহাকে কথঞ্চিৎ নির্ভয় করিতে পারিবে।

যে সকল সামর্থ্যবান মহাপুরুষেরা অলৌকিক ক্রিয়াজাল (Miracles) বিস্তার করিয়া লোকের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা কেবল লোকসংঘট্ট-যোজনা করিয়া সমাজের বাহ্যঠাট কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? এই জন্য সুদূরদর্শী সাধুরা এই মায়াজাল বিস্তার করিয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে চাহেন না। মহাপুরুষ বুদ্ধদেব তাহা করেন নাই, মহাপ্রভু চৈতন্য দেবও তাহা করেন নাই, প্রভু যীশুখৃষ্টও অল্পদিন মাত্র এই অলৌকিক ক্রিয়ার অবতারণ করিয়া পরে তাহার অসারত্ব বুঝিয়া ছিলেন, এবং বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়াও তৎসম্পাদনে বিশেষ বিরক্তির সহিত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার বিবিধ ঘটনাপূর্ণ সুদীর্ঘ জীবনে লৌকিক ভাবের সীমা কদাচ অতিক্রম করিতেন না,—কদাচ স্বকীয় ঈশিত্ব ও লোকাতীত সামর্থ্য লোকচক্ষে প্রদর্শন করিতে প্রলুব্ধ হইতেন না। ভারত-যুদ্ধে ও তাহার পূর্ব্বপরবর্ত্তী সমস্ত ব্যাপারে তাঁহাকে এই লৌকিক গণ্ডির মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে দৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল মহাপুরুষদিগকে এবং তাঁহাদের অলোক-সামান্য স্বর্গীয় গুণাবলীকে লোকে অবাক্ হইয়া পূজা করে, অর্চ্চনা করে, আরাধনা করে। সেই অর্চ্চিত বস্তু কিন্তু লোকের উপাসনালয়েই থাকিয়া যায়; তাহাদের প্রাণে, তাহা-

দের মর্ম্মে তাহা প্রবিষ্ট হয় না। তাহাদের জীবনের সঙ্গে তাহা মিশিয়া যায় না। তাহাদের মস্তকের উপর এত উচ্চ আকাশে তাহাকে রাখা হয় যে, তাহারা তাহার আর নাগাইল পায় না।

এই জ্ঞানমূলা ভক্তি শাস্ত্রাদি লব্ধ বহুবিধ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, তাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের আকর নহে। সে জ্ঞানে হৃদয়ের গ্রন্থিচ্ছেদ হয় না, মনের সংশয়জাল দূরীকৃত হয় না। সে জ্ঞান পার্থিব পদার্থ; স্বর্গের অপ্রাকৃত ধন নহে।

প্রকৃত পরাভক্তি এই অপার্থিব স্বর্গীয় জ্ঞানের আকর। তাহা অন্তরের কোন অগাধ অতল প্রদেশের অপরিজ্ঞাত মূল হইতে স্বতঃস্ফূরিত হইয়া হৃদয়কে পরিপূর্ণ ও সুস্নিগ্ধ করতঃ উজান পথে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ধাবিত হয়। ইহাই অহেতুকী ভক্তি নামে সমাদৃত হইয়া থাকে। এই ভক্তি বহির্দ্দেশে উচ্ছ্বাস ময়ী ও অন্তর্দ্দেশে বিশুদ্ধ জ্ঞানময়ী। এই জ্ঞান শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বহুদর্শন সম্ভূত নহে। ইহা এই পরাভক্তির সহজাত। অগ্নির আলোক ও উত্তাপ বহির্দ্দেশে অভিব্যক্ত থাকে, কিন্তু তাহার দাহিকা শক্তি অন্তর্দ্দেশে অব্যক্ত থাকে; তেমনি এই অহেতুকী ভক্তির বাহিরে উচ্ছ্বাস, কিন্তু অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞান। যে ভক্তির অন্তর্দ্দেশে অপ্রাকৃত স্বর্গীয় জ্ঞানের আকর নাই, তাহা অহেতুকী ভক্তি নহে।

এই অপ্রাকৃত পরাভক্তি involuntary অকাম-প্রসূতা, এবং spontaneous স্বতঃসিদ্ধ। ইহা স্বতই উৎপন্ন হয়। ইহা "আপনি উঠে, আপনি মেটে, নিবারিতে নারে কেউ।" ইহা ব্রহ্মসত্বার ন্যায় স্বতঃ-স্বপ্রকাশ।

ইহাঁ যথার্থই পতিতপাবনী গঙ্গা। বিষ্ণুপদে ইহাঁর উৎপত্তি,

মৃত্যুঞ্জয় শিবের মস্তকে ইহাঁর সর্ব্বকাল অবস্থিতি। সাগরাভি-মুখে ইহাঁর গতির ক্ষণকালের জন্যও বিরাম নাই। ইহাঁর বিন্দু স্পর্শে জীব পবিত্র হয়, তাহার ত্রিতাপের শান্তি হয়। এই পতিতপাবনী স্রোতস্বতীতে যে কোন প্রবাহিনী আসিয়া পতিত হয় তাহা বিশুদ্ধা ভক্তিতে পরিণত হয়।

ইহা যথার্থই পরব্রহ্মের নির্ম্মলা প্রকৃতি, তিনি ইহাঁর দিব্যাঙ্গে নিত্যকাল বিহার করেন। তিনি কোথাও ইহাঁকে ছাড়িয়া প্রকাশিত হন না; এই ভক্তিও কোথাও তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকেন না। উভয়ে পরস্পরের নিত্যসঙ্গী। প্রকটকালে এই উভয়ের যুগলত্ব কুত্রাপিও ভঙ্গ দৃষ্ট হয় না।

এই পরা ভক্তি সেই পরম পুরুষের উত্তমাঙ্গ। তিনি এই নির্ম্মল দেহের অন্তরাত্মা। এই উত্তমাঙ্গেই তাঁহার সর্ব্বোত্তম লীলা। ইহাঁতেই তাঁহার ক্রীড়া ও রতির সর্ব্বোত্তম স্ফূর্ত্তি। তিনি এই নির্ম্মল দেহের অঙ্গ-কান্তি, এই অপ্রাকৃত পুষ্পের অপ্রাকৃত সৌরভ, এই অপ্রাকৃত আবির্ভাবের অপ্রাকৃত মর্ম্মস্থান। তিনি এই দেহের সঙ্গে অভেদ।

এই অহেতুকী পরা-ভক্তির স্বভাবতই যুগল মন্ত্রে উপাসনা। ইনি যেমন পরব্রহ্মের অনুরাগী, তেমনি মানুষেরও অনুরাগী। ইনি একটীকে ছাড়িয়া, অপরটীর অভিমুখে ধাবিত হয়েন না। ইনি এক সঙ্গে অন্তর্দ্দেশে অতলাভিমুখী ভোগবতী, উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাভিমুখী মন্দাকিনী, এবং ইহ সংসারে জনগণাভিমুখী ভাগি-রথী। ইহাঁর নির্ম্মল দৃষ্টিতে সংসার-ক্ষেত্র ব্রহ্ম-ক্ষেত্রাকার ধারণ করিয়া থাকে। এ দৃষ্টি এই সংসার-তরুর যে কোন স্থানে পতিত হয়, সেখানে সেই দৃষ্টিতে নির্ম্মল ব্রহ্মফল ফলিয়া প্রকাশ

পায়। এই অপ্রাকৃত পরাভক্তির সকল স্থানেই, সকল ঘটেই ইষ্টস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

এই সুদুর্লভা পরাভক্তির দৃষ্টি ও অনুরাগ এইজন্য সর্ব্বদাই দৃশ্য বর্ত্তমানের অভিমুখিন্, অদৃশ্য অনুমানের অভিমুখিন্ নহে। যিনি উন্মীলিত চক্ষে দৃশ্য বর্ত্তমানে সেই নির্ম্মল বস্তুকে ধরিতে পারেন, তাঁহার নিমীলিত নেত্রে অদৃশ্য অনুমানের দিকে তাকাইবার প্রয়োজনাভাব। এই জন্য ইহাঁর অদৃষ্টেরও ভাবনা নাই, দৃশ্যমানেরও পূজা নাই। "অদৃশ্যের ভাবনা নাস্তি, দৃশ্যমানং ন পূজয়েৎ।" ইহার ঠাকুর অন্তরেও নিরুদ্ধ নহেন, বাহিরেও আবদ্ধ নহেন। তিনি একসঙ্গে ইহাঁর অন্তরের ভাব ও বাহিরের আবির্ভাব। তিনি একসঙ্গে ইহাঁর অন্তরে সংস্থিত থাকিয়া বাহিরে বর্ত্তমান। এই পরাভক্তি কখনও শুদ্ধ অন্তরের অনুভবে উদয় হন না, এবং কখনও শুদ্ধ বাহিরের আবির্ভাবেও প্রকাশ পান না। এই যুগল ভাব অভঙ্গরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত না হইলে, এই পরাভক্তি চক্ষু উন্মীলন করিয়া চাহিয়া দেখেন না। যাহা শুদ্ধ অন্তরে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, বাহিরে খুঁজিরা পাওয়া যায় না, অথবা যাহা শুদ্ধ বাহিরে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, অন্তরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহা পরাভক্তির ভগবান নহেন। পরাভক্তির ভগবান যেমন অন্তরের দেদীপ্যমান অগ্নি, তেমনি বাহিরের অত্যুজ্জল আলোক। এই অপ্রাকৃত অগ্নি ও আলোকে ত্রিতাপ সুশীতল হয়। এই পরাভক্তির ভগবান, অন্তরে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ও তৎসঙ্গে বাহিরে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। এই পরাভক্তির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কত সত্য, কত তত্ত্ব, কত বেদ, কত বেদান্ত নিরন্তর উচ্ছ্বাসিত হইয়া থাকে। বাহিরের বেদ বেদান্তের প্রতি ইহার তাদৃশ অনুরাগ নাই।

এই পরাভক্তি নিয়তই ঋণদায়ে অস্থির। ইনি "সবাকার ঋণী", সকলের নিকট ঋণগ্রস্ত। ইনি এইভাবে, সর্ব্বদাই জড়সড়। ইনি যাবজ্জীবন এই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু পরিশোধ করিতে আপনাকে নিতান্ত অসমর্থ দেখিয়া সর্ব্বদাই কাতর। ইনি প্রত্যেকের সম্বন্ধে "a debt immense of endless obligation" অনুভব করিয়া থাকেন। ইনি যথাসর্ব্বস্ব দান করিযাও,—প্রাণ ঢালিয়া দিয়াও ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হন না,—কিছু শোধ দিলাম বলিয়া অনুভব করিতে পারেন না। ইনি যেন সকলের ধন গচ্ছিত রাখিয়াছেন এবং সেই ভাবে আপনাকে ভারাক্রান্ত অনুভব করিতেছেন। ইনি তোমার ধন তোমাকে দিয়াও সমস্ত পরিশোধ হইল না দেখিয়া, তোমার দাসত্ব করিতে প্রস্তুত। জ্ঞান যেখানে আপনার স্বর্গীয় অধিকার হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া আপনার স্বর্গীয় সনন্দ শিরস্ত্রাণে বাঁধিয়া ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন, এই পরাভক্তি সেখানে লোকের অপরীশোধনীয় ঋণ পরিশাধার্থ "ব্রহ্মাব ডুল্লভধন" মুক্ত হৃদয়ে বিলাইয়াও স্বকীয় ঋণভার মোচন হইতেছে না দেখিয়া হায় হায় করিতে থাকেন।

এই পরাভক্তি অনুক্ষণ সচৈতন্যা। ইনি জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থাতেই চৈতন্য বিশিষ্টা। ইহাঁর সংসার-স্বপ্ন ভঙ্গ হইযাছে। ইহাঁর সংসার প্রবৃত্তির নিরত্তি হইয়াছে। ইহাঁর রজ্জুতে সর্প ভ্রম,—জ্যোতিতে অন্ধকার দর্শন তিরোহিত হইয়াছে। সংসারের ধন, জন, ঐশ্বর্য্যের মোহিনীশক্তি ইহাঁকে আবরিত বা বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না। সংসারের বিভীষিকা ইহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না। ইনি কায়স্থিতা হইয়াও মায়ার পরপারে সর্ব্বদা বাস করেন।

এই পরাভক্তি জীবদশা থাকিতে স্ফূর্ত্তি পান না। ইনি মৃত্যুঞ্জয় শিবেরই শিরোভূষণ। যাঁহারা জীবত্ব অন্ত হইয়াছে ইনি তাঁহাকে নবজীবনে প্রতিষ্ঠিত ও শিবচৈতন্যে ভূষিত করিয়া থাকেন; ইনি ক্রুশ-হত যীশুকে পুনরুত্থিত করিয়া খ্রীষ্ট পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি মরণধর্ম্মশীল জীবের জীবত্ব নাশ করিয়া শিবত্বদানে মৃত্যুঞ্জয় করেন।

এই পরাভক্তির গাঢ়তাই প্রেম এবং প্রেমের গাঢ়তাই মহাভাব নামে অভিধেয় হইয়া থাকে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হিন্দু ও য়ীহুদা জাতীর বিশেষ ধর্ম্মভাব।*

মহানুভব লোকদিগের প্রকৃতিতে এক একটী বিশেষ স্বর্গীয় ভাব থাকে। তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই সেই সেই ভাবের এক একটী অবতার বলিলে বলা যায়। তাঁহাদের প্রকৃতির গঠনে সেই বিশেষ ভাবই প্রধান উপকরণ;—সেই ভাব তাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত, সর্ব্বদা জীবন্ত। তাঁহাদের আত্মা তন্ময় ও তদ্গদ। তাঁহাদের সমস্ত জীবন সেই ভাবের সাধন ও প্রচারে অতিবাহিত হয়। তাঁহাদের সকল চিন্তা, সকল কামনা ও সকল কার্য্য সেই ভাবের দিকেই উন্মুখ থাকে। সমস্ত সংসার তাঁহাদের সেই ভাবের সম্পোষণে সহায়তা করে। মানবীয় কার্য্যক্ষেত্রের যাবতীয় বিভাগেই, বিশেষতঃ ধর্ম্মবিভাগে এরূপ মহানুভব মহাপুরুষদিগের (মধ্যে মধ্যে যখন প্রয়োজন হয়) আবি-

---

* সমদর্শী,—১৭৯৭ শক, আষাঢ়। আশা,—১৮১৪ শক, জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন।

* "সমদর্শী" সম্পাদক এই প্রস্তাবের য়ীহুদা অংশ হারাইয়া ফেলেন, সুতরাং ইহা তখন উক্ত পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি তাহা প্রক্ষি-প্রবৃত্ত হইয়া "আশাতে" প্রকাশিত হইয়াছে।

র্ভাব হইয়া থাকে। ঈশ্বরের অক্ষয় সত্য মস্তকে বহন করিয়া পৃথিবীতে আনিয়া তাঁহারা সংরোপণ করেন এবং কৃতজ্ঞ পৃথিবী চিরকাল ধরিয়া সেই স্বর্গীয় বীজ অতি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষণ ও পোষণ করে। সে বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয়, এবং অমৃত ফল প্রসব করিয়া জগতের লোকদিগকে সত্যান্ন পরিবেশন করে। ধুরন্ধর মহাপুরুষদিগের ন্যায় ধুরন্ধর জাতি সমস্তও অনুরূপ বিশেষ ভাব সম্পন্ন। কোন কোন বিশেষ ভাব কোন শ্রেষ্ঠ জাতির মধ্যে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেই সেই জাতি গুরুর ন্যায় তাহাদের হৃদয়জাত বিশেষ ভাব অন্যান্য জাতিদিগকে শিক্ষা দান করেন। এইরূপে পরস্পরের স্বোপার্জ্জিত সত্য-পুঞ্জ পরস্পরে শিক্ষা করিয়া উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দু ও য়ীহুদা জাতিদ্বয় সর্ব্ব প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাস্তবিক পূর্ব্বকালীন ধার্ম্মিক জাতিদের গণনা-রম্ভে সর্ব্ব প্রথমেই ঐ দুই জাতিকে স্মরণ করিতে হয়। উহাঁদের প্রকৃতি-সম্ভূত বিশেষ ধর্ম্মভাব হইতে যে দুই পুরাতন ধর্ম্মপ্রণালী অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাদের একটী না একটী কোন না কোন প্রকারে প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গ্রাহ্য হইয়াছে। য়ীহুদা ধর্ম্ম হইতে খ্রীষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম, এবং হিন্দু ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া সমস্ত সভ্য সমাজে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। এই দুই পুরাতন ধর্ম্ম-মূলে যে অগণন সত্যরত্ন নিহিত থাকিবে, তাহা বিচিত্র কি?

ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের বিশেষ ধর্ম্মভাব হইতে য়ীহুদা দেশীয় বিশেষ ধর্ম্মভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমটী ধ্যান-ধারণা-প্রধান;

দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠানমূলক। প্রথমটী তন্মনা, একাগ্রমনা হইয়া, শান্ত সমাহিত হইয়া অহর্নিশ সেই অনন্তের প্রেমে ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে অনুরোধ করে; দ্বিতীয়টী ঈশ্বরের ধর্ম্মাদেশ পালনে নিয়োজিত করে। "ধ্যানে নিমগ্ন হও"—ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষিগণ এই দৈববাণী বিশেষরূপে শ্রবণ করিয়াছিলেন; "আদেশ পালন কর"—য়ীহুদা দেশীয় ঋষিগণের শ্রবণ কুহরে এই দৈববাণী বিশেষরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। আর্য্যেরাও, আদেশ পালন করিতেন, য়ীহুদারাও ধ্যান করিতেন; কিন্তু ঐ উভয় জাতির বিশেষ ধর্ম্মভাব স্বতন্ত্র পথে পরিভ্রমণ করিয়াছিল। একটী পবিত্র মন্দাকিনীর ন্যায় উর্দ্ধমুখে স্বর্গলোকে পুষ্পকাননে গিয়া বিচরণ করে, অপরটী ভাগিরথীর ন্যায় নিম্নগামী হইয়া ধরাপৃষ্ঠে শত শত জনপদকে উর্ব্বর ও ফলশালী করিয়া পরিভ্রমণ করে। এই পুরাতন জাতিদ্বয়ের প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যহেতু বিশেষ ভাবগত এই বৈলক্ষণ্য সম্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ উভয়-বিধ বিশেষ ভাব বিভিন্ন পন্থার অনুসারী হইলেও তাহাদের মূলে কোন বৈলক্ষণ্য নাই। উহাদের মূলদেশ এক। ধর্ম্মরূপ মহী-রুহের মূলভাগ পৃথিবীর অভ্যন্তর মধ্যে সর্ব্বব্যাপী হইয়া রহি-য়াছে। কোন দেশে কোন স্থানে তাহার অস্তিত্বের অভাব নাই। সেই মূল সর্ব্বত্র অলক্ষিতরূপে নিহিত। পৃথিবীর সকল জাতি তাহার উপকার অল্পাধিক লাভ করিয়াছে, কোন দেশ বা জাতিকে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। জল বায়ুর ন্যায় তাহা সর্ব্বত্রই অযত্ন বা অল্পায়াস লভ্য হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই মূলদেশ হইতে বিশেষ বিশেষ শাখা সমূহ দেশ বিশেষে, কাল ও অবস্থা বিশেষের অনুগত হইয়া মৃত্তিকা উদ্ভিন্ন করতঃ

আকাশমার্গে উত্থিত হইয়াছে এবং তথাকার উর্ব্বরতা শক্তি পরিচয় প্রদান ও গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছে। তন্মধ্যে দুইটী প্রকাণ্ড শাখা, একটী আর্য্যাবর্ত্তে, একটী য়ীহুদা দেশে অক্ষয় বটবৃক্ষের ন্যায় সমুত্থিত হইয়া সুদূর পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

এই শাখাদ্বয়ের প্রশাখা হইতে শত শত প্ররোহ (নামনা) নামিয়া শত শত দেশের ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে অধিকার ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। যে সমস্ত দেশে এই সকল প্ররোহ স্ব স্ব মূলদেশ প্রোথিত করিয়া বসিয়াছে, সেই সমস্ত স্থানে তাহাদের তেজঃপ্রভাবে পূর্ব্বোৎপন্ন শাখা সমূহ বিনষ্ট হইয়াছে, এবং ভূগর্ব্বস্থ মূল দেশ হইতে নূতন শাখাও সমুৎপন্ন হইতে পারে নাই। যে সকল দেশে পূর্ব্বোক্ত প্রকাণ্ড শাখা দ্বয়ের অধিকার বিস্তৃত হয় নাই, সেই সেই স্থানে অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাও শীর্ষোত্তোলন করিয়াছে বটে; কিন্তু তাহারা এত ক্ষুদ্র যে, সচরাচর গণনাস্থলে আইসে না। এই শাখাগুলি বিশেষ বিশেষ দেশের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মভাব। বিশেষ ধর্ম্মভাবে কোন দুই জাতির ঐক্য নাই। শাখা সমূহের মূল ভূগর্ত্তে নিহিত বলিয়া লোকে অজ্ঞান বশতঃ স্ব স্ব শাখা বিশেষের পক্ষপাতী হইয়া সাম্প্রদায়িক ও অনুদারভাবে শাখান্তরকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, কিন্তু সময়ে যখন সেই ভূমধ্যস্থ বিরাট বৃক্ষমূল নৈসর্গিক উন্নতির নিয়মানুসারে ভূপৃষ্ঠ উদ্ভিন্ন করিয়া প্রকাশিত হইবে এবং লোকে জ্ঞানালোকে স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, একই মূল হইতে সেই সমস্ত শাখা উৎপন্ন, তখন বিবাদ বিসম্বাদ দূরে থাকুক, বিশেষ বিশেষ

শাখা বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় বা জাতির নিজস্ব থাকিবে না। সমুদায় শাখাই তখন এক বিশাল বৃক্ষের অঙ্গরূপে যাবতীয় মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইবে এবং সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা চলিয়া যাইবে। তখন লোকে অস্ত্রধারণ করিবে বটে, কিন্তু সে কেবল যে সমস্ত ভ্রম ও কুসংস্কারের কণ্টকীলতা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শাখা প্রশাখা সমূহ সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড করিবার জন্য,—বিজাতীয় সত্যকে উন্মূলিত করিবার জন্য নহে। বর্ত্তমান সময়ে উল্লিখিত শুভদিনের সুপ্রভাতের লক্ষণ সকল চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হইতেছে।

হিন্দু ও য়ীহুদা এই উভয় জাতি তাহাদের স্ব স্ব বিশেষ ধর্ম্ম-ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া পরস্পরে স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট সাধন পন্থায় পরি-ভ্রমণ সময়ে ধর্ম্মরাজ্যের যে সকল নিগূঢ় সার সত্য আবিষ্কার পূর্ব্বক ভাবী বংশ সকলের জন্য পুরাবৃত্তের সুবিস্তৃত ভাণ্ডার যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ ও রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, নিরপেক্ষ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

আর্য্যঋষিরা তাহাদের বিশেষ ভাব ধ্যান ধারনাকে সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্ম-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যাঁহারা নিমীলিত নয়নে সাধনা করেন, তাঁহারা অচিরে বহির্জ্জগতের প্রতি নিদ্রিত কিন্তু অন্তর্জ্জগতের প্রতি জাগ্রত—কর্ম্মের প্রতি নিশ্চেষ্ট কিন্তু চিন্তার প্রতি তৎপর হইয়া পড়েন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল;—তাঁহারা যে সমস্ত অমূল্য সত্যরত্ন উপা-র্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই চিন্তালব্ধ,—কর্ম্মলব্ধ অতিঅল্পাংশ মাত্র। অন্তরের মধ্যে হৃদয়ের নিভৃত স্থানে সেই অন্তরতম প্রিয়তম পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার

অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রে অনুক্ষণ নিমগ্ন থাকিবার জন্য, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মা রূপে হৃদয়ের অতি নিকটে সর্ব্বদা অনুভব করিবার জন্য, আপনাকে ভুলিয়া, জগৎ সংসারকে ভুলিয়া সেই আনন্দ স্বরূপের আনন্দরস পানে অভিভূত হইবার জন্য, তাঁহাদের সকল চেষ্টা যে সর্ব্বাগ্রেই নিয়োজিত হইয়াছিল সে কেবল ধ্যানের প্রভাবে। তাঁহাদের দিব্য-চক্ষে ঈশ্বর কোন দূরস্থ বাহ্যিক পদার্থ ছিলেন না, কোন বজ্রবর্ষী ক্রোধাবতার ভীষণ কালান্তক রুদ্র ছিলেন না, কোন পুরাণ-কল্পিত সীমাবিশিষ্ট হস্ত পদাদি যুক্ত মানবাকৃতি ছিলেন না, ছায়ার ন্যায় মৃত্যুর প্রতিকৃতি কোন অবাস্তবিক পদার্থ ছিলেন না ; তাঁহারা তাঁহাকে অতি নিকটস্থ জানিয়া, অন্তরের অন্তরস্থ জানিয়া, মঙ্গলালয় শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ও রসস্বরূপ জানিয়া, অনাদ্যনন্ত অতীন্দ্রিয় অথচ সত্যের সত্য জানিয়া—"করতল-ন্যস্ত অমলকবৎ" তাঁহাকে বিশ্বাস হস্তে স্পর্শ করিতে ও জ্ঞান চক্ষে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যে আর কোন পুরাতন জাতি ঈশ্বর বিষয়ক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, এতদূর পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। চারিদিকে ঈশ্বরের উজ্জ্বল সত্তা উপলব্ধি করিয়া সমস্ত হৃদয়ের সহিত অগ্নিময় জীবন্ত বাক্যে তাঁহাকে "সত্যং" "সত্যস্য সত্যং" বলিতে আর কোন্ জাতি পারিয়াছেন ? আর কোন্ জাতি আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাঁহাকে এত সুস্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিয়া জীবনপূর্ণ তেজঃপূর্ণ বাক্যে "প্রাণের প্রাণ" "অন্তরের অন্তরাত্মা" বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ? আর কোন্ জাতি জীবন্ত বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকে "পরমগতি" "পরমসম্পদ" "পরমলোক" ও "পরমানন্দ" জানিয়া একমাত্র

কেবল তাঁহাতেই ইহলোক ও পরলোক সাধন করিয়া ছিলেন? আর কোন্ জাতি তাঁহার পবিত্র সহবাসে ভোগতৃপ্ত হইয়া আত্মার অতি গভীর প্রদেশ হইতে তাঁহাকে "আনন্দস্বরূপ" "রসস্বরূপ" বলিয়া উপভোগের বিষয় করিতে শক্ত হইয়াছিলেন? পৃথিবীর পুরাবৃত্ত সকল এ প্রশ্নে নিরুত্তর থাকিবে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক ঈশ্বরের অনন্ত পূর্ণভাব, যাহা তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ হইতে প্রত্যাহার করিয়া লইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব বিলুপ্ত হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে আর্য্য-হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়াছিল। সত্য বটে আর্য্যগণ প্রকৃত সত্যের অর্দ্ধাবয়ব মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন, অপরার্দ্ধ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক নেত্র পথে পতিত হয় নাই। তাঁহারা ঈশ্বর লাভের সম্পূর্ণ ভাব বুঝিতে পারেন নাই। নিরবচ্ছিন্ন কেবল ঈশ্বরেতে নিমগ্ন থাকাই তাঁহাদের ঈশ্বর লাভ। তজ্জন্য জীবনের সঙ্গে তাঁহাকে সংযুক্ত ও সম্মিলিত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্যকরূপে তাঁহাদের দৃষ্টিপথের অন্তর্ভূত হয় নাই। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিয়া অনন্তের ধ্যানে নিবিষ্ট হওয়াই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু তৎসাধনার্থ বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আদেশ পালন ও প্রদত্ত ভার মস্তকে বহন করা তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। তাঁহারা ঈশ্বর সাধন করিতে গিয়া সংসার সাধনের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত নিগূঢ় যোগ স্থাপন করিতে গিয়া মনুষ্য সাধারণের সহিত দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ধ্যানের রাজ্য সংসারের অতীত। সে রাজ্য নির্জ্জন। সেখানে সকলেই একাকী। সেখানে ভাই বন্ধু দারা সুত কেহই নাই। সে রাজ্যের ব্যাপার আলোকেও প্রকাশ করিতে পারেনা, অর্দ্ধ-

কারেও আচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। সেখানে কেবল আমি ও আমার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন, ও অন্তরের অন্তরাত্মা। এ রাজ্যের সাধকেরা বাহিরের সমস্ত বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন, তাঁহাদের সঙ্গী নাই, সহচর নাই। তাঁহারা সকলে স্ব স্ব প্রধান, পরস্পর কেহই কাহাকে দেখে না, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না। এরাজ্যে গুরু নাই, শিষ্য নাই নেতা নাই অনুযাত্রী নাই। এরাজ্যে সকলেই স্বতন্ত্র, প্রত্যেকেই আপনার জন্য ঈশ্বরের নিকট মগ্ন, কেহ কাহাকে লইয়া নহে। এরাজ্যে ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, মধ্যবর্ত্তী নাই। নিরবলম্ব ব্রহ্মযোগই এ রাজ্যের আদ্যন্ত। আর্য্যভূমি ভারতবর্ষে কথনই যে ঐক্য স্থাপন হইতে পারে নাই, আর্য্য জাতির অন্তরস্থ এই বিশেষ ভাবই এ বিষয়ে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল। কর্ম্ম ক্ষেত্রেই ঐক্য বন্ধনের আবশ্যকতা অনুভূত হয়, কর্ম্মক্ষেত্রেই জাতিগত বন্ধনের সূত্রপাত হয়। কর্ম্মক্ষেত্রেই ঈশ্বরকে স্বজাতির নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয়। ধ্যানের রাজ্যে সংসার সাধন নাই, ঐক্য বন্ধন নাই, সাধারণ উপাসনা নাই, সাধারণ উৎসব নাই, উপাসনা ও উৎসবের জন্য সাধারণ মন্দির নাই। এই সকলের অসদ্ভাবে ভারতবর্ষে জাতিগত বন্ধনের ব্যাঘাত হইয়াছে। হিন্দুরা কথনই এক জাতির অন্তর্গত ছিলেন না। বহু কাল হইতে তাঁহারা বহুজাতিতে বিভক্ত। তাঁহাদের মধ্যে নানা জাতি, নানা সম্প্রদায়, নানা বর্ণ ও নানা উপবর্ণ পরস্পারের এত বিচ্ছিন্ন ভাব বিদ্যমান যে, তেমন আর কোথাও নাই। তাঁহাদের মধ্যে সাধারণ ভাবের উদ্বোধ হয় নাই। তাঁহাদের একতা বন্ধন না থাকাতে ভারতভূমি বহুকালাবধি পরহস্তগত হইয়া

রহিয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই, ক্ষতি নাই, দুঃখ নাই। এজন্য ভারতবাসী আর্য্যসন্তানেরা একদিকে অনেকটা স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছেন। ঈশ্বরের সহিত সম্যক্‌রূপে সংযুক্ত হওয়াই যখন প্রধান সাধন, তখন চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা অবশ্যই মানিতেন; কিন্তু তাহার অর্থ সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত ভাবে গৃহীত হইত। তাহা অভাব পক্ষে, ভাব পক্ষে নহে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপত্যাগ ও মনের একাগ্রতা সাধনই তাঁহাদের তদুদ্দেশে কেবল মাত্র তপস্যা ছিল। সংসার হইতে প্রতিনিবৃত্তি হেতু বিস্তৃত ও উপযুক্ত ক্ষেত্রের অসদ্ভাবে কেবল অন্তরের মধ্যে সে তপস্যা বদ্ধ ছিল, সুতরাং সর্ব্বদা তাহা সম্পূর্ণ সফল হইত না। আর্য্য ঋষিরা ধ্যান-পথবর্ত্তী ঈশ্বরকে নিশ্চেষ্ট ও নিষ্কর্ম্মা দেখিতেন, এবং এই একদেশদর্শী দৃষ্টি ও বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী অনিষ্টময় ফল তাঁহাদের জীবনে ফলিয়াছিল। তাঁহারা তন্নিমিত্ত কার্য্য হইতে সর্ব্ব প্রযত্নে অবসর গ্রহণ করিতেন, এবং তন্নিমিত্ত ঐতিহাসিক ঘটনার স্রোতে ঈশ্বরের মঙ্গল হস্ত ও তাঁহার জীবন্ত সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে শিক্ষা করেন নাই। ঘটনার নিয়ন্তা বলিয়া, জীবনের নেতা বলিয়া, সম্পদের সহায় ও বিপদের কাণ্ডারী বলিয়া একান্তমনে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে তাঁহাদের সাধন হয় নাই। ঈশ্বরের বিশেষ করুণার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবার স্থলও তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। সেই অগম্য, অপার, অনন্ত ও অপারসীমকে নিজস্ব ধন, নিজস্ব দেবতা বলিতে তাঁহাদের সাহস হয় নাই। সত্ত্বা সম্বন্ধে যিনি নিকট হইতে নিকটে থাকিয়া মহিমা ও উচ্চতাতে দূর হইতেও সুদূরে, কেমন করিয়া তাঁহাকে আমার বা আমাদের ঈশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন, তাহার পথ তাঁহারা

দেখিতে পান নাই। তাঁহারা যে বিশ্বাসী ছিলেন না, একথা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাস কার্য্যের জগৎ হইতে, ঐতিহাসিক ঘটনার জগৎ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আধ্যাত্মিক জগতের সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের জ্ঞানময় সত্বার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতঃ এক আশ্চর্য্য মধুর ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাঁহারা বিপদের কাণ্ডারী সম্পদের সহায় ও জীবনের নেতার উপর নির্ভর করিতে না শিখুন ও তাঁহার বিশেষ করুণার দিকে প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দৃষ্টিপাত না করুন, (যে পথে সে নির্ভরের ভাব ও বিশেষ করুণার জ্ঞান শিক্ষা হয়, তাঁহারা সে পথ দিয়া যান নাই), কিন্তু সুখ, দুঃখ, সম্পদ ও বিপদকে অনিত্য অসার ও কল্পনা বোধে বীরের ন্যায় তুচ্ছ করত: আনন্দময়ের আনন্দ সাগরে নিমগ্ন থাকিয়া আর এক প্রকার অত্যুচ্চ ও স্বাধীন ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কর্ম্মপথ সুখ দুঃখময়, কিন্তু ধ্যানের পথ সুখ দুঃখের অতীত। তাঁহারা সেই উচ্চস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন যেখানে সুখ দুঃখের পরিবর্ত্তনশীল তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে না। তাঁহাদের ঈশ্বর নিষ্কাম ও নির্গুণ। তিনি অব্যক্ত "ব্যক্তরূপ" নহেন, তিনি নির্গুণ, গুণাত্মন্ নহেন। তাঁহাদের উপাসনার আদর্শও নিষ্কাম, সে আদর্শের নিকট জগতের মঙ্গল কামনাও কামনা বলিয়া দূষণীয়। বস্তুতঃ তাঁহারা ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে অন্য কোন প্রকার লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় করিতেন না,—সেই পরম লক্ষ্য ভিন্ন অন্য সকল প্রকার লক্ষ্যকে অন্তরে স্থান দিতেন না। তাঁহাদের ঈশ্বর সর্ব্বকাম-বিবর্জ্জিত; তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই, সুতরাং কার্য্যও নাই। যাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস, তাঁহারা যে কর্ম্মকাণ্ডকে

নিকৃষ্ট বোধে জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য ভার বহন করিতে অস্বীকার করিবেন. তাঁহা বিচিত্র কি? তাঁহাদের ঈশ্বর স্নেহ মমতা শূন্য উদাসীন, এজন্য তাঁহার সঙ্গে পারিবারিক সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে নাই, তিনি দয়াময় পিতা, তিনি স্নেহময়ী মাতা, ইহার তাৎপর্য্য তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। যাঁহারা নিষ্কাম উদাসীন ঈশ্বরের উপাসক, মুদ্রিত নয়নে ধ্যানপর না হইলে যাঁহারা ঈশ্বরের সঙ্গে কোন যোগ স্থাপন করিতে না পারিয়া অন্ধকার দেখেন, কর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ থাকা কোন প্রকারে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং ঈশ্বরের নিকট কার্য্য সিদ্ধির জন্য ধর্ম্মবল প্রর্থনার ভাব আর্য্য সন্তানগণের মনোমধ্যে সম্যক্‌রূপে বিকসিত হইতে পারে নাই। যেখানে কার্য্যের ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ সাধন হয়, সেখানে প্রার্থনার ভাব আপনা হইতে অঙ্কুরিত হয়। কার্য্যক্ষেত্র স্বরূপ এই অখিল বিশ্বের প্রতি তাঁহারা যখন নেত্রপাত করিতেন, অলীক ও অনিত্য বোধে ইহা হইতে তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নিমীলিত নয়নে হৃদয়ের অন্তঃপুরে সেই সত্যের সত্যকে অনুসন্ধান করিবার জন্য অভ্যস্ত হইতেন। আর্য্য সন্তান দিগের পক্ষে চিন্তাই সর্ব্বস্ব, কার্য্য অবহেয়। কার্য্য ও ঘটনাকে এতদূর অশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন যে তাঁহারা কস্মিনকালে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য কলাপ ও পরিদৃষ্ট ঘটনা পুঞ্জের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ ও স্মরণীয় করিয়া রাখিবার প্রয়াস পান নাই। কিন্তু চিন্তা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ তাচ্ছিল্য তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই; বরং এই সম্বন্ধে তাঁহাদের সমূহ যত্ন ও মনোযোগই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাদের মানস-ক্ষেত্রের

উপর দিয়া যে সমস্ত চিন্তার হিল্লোল বহমান হইয়াছিল, অতি যত্নে ও সন্তর্পণে তৎসমুদয় রক্ষা ও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের রচিত কোন ইতিহাস গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না, অথচ বহুকালাবধি চিন্তালব্ধ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল উপনিষদাদি গ্রন্থে সংগৃহীত দৃষ্ট হইতেছে।

আর্য্যসন্তানগণের নিজ নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয় নাই, সুতরাং জীবনের আধ্যাত্মিক আদর্শের ভাবও পরিস্ফুট হয় নাই। তাঁহাদের ঈশ্বর ইচ্ছা ও কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং তাঁহাকে পুণ্যময় ও পবিত্র বলিয়া তাদৃশ হৃদয়ঙ্গম করা হয় নাই। জীবনের একটী পবিত্র আদর্শের অভাবে পাপপুণ্যের সুস্পষ্ট ভাব তাঁহাদের মধ্যে বিকশিত হয় নাই। জীবনের একটী পবিত্র আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া পাপকে যেরূপ ঘৃণা-চক্ষে দেখিতে হয়, ধর্ম্মরাজ্যের রাজা, ধর্ম্মজগতের নিয়ন্তা ও বিচারপতিকে সম্মুখে রাখিয়া যেরূপ সভয় ভাবে রাজাজ্ঞার সম্মান করিতে হয়, সে ভাবে তাঁহাদের শিক্ষা হয় নাই। তপশ্চর্য্যায় বিঘ্নকারী বলিয়া, অভীষ্ট সিদ্ধির প্রতিবন্ধক বলিয়া তাঁহারা পাপকে পরিত্যজ্য মনে করিতেন এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে সচেষ্ট হইতেন। পাপের প্রকৃত ভাবও তাঁহাদিগের হৃদ্গত ছিল না। যে ব্যক্তি পাপকে আত্যন্তিক ঘৃণিত বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহারই হৃদয়ে আত্মানুশোচনার গভীরতা অনুভূত হয়; যে ব্যক্তি পাপকে রাজাদেশ উল্লঙ্ঘন মনে করিয়া ভীত হয়;—প্রত্যেক পাপের বিচার হইবে, প্রত্যেক পাপের দণ্ড তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমাগত হইবে, ধর্ম্মরাজ্যের রাজার চক্ষে ধুলি দিয়া বা তাঁহার উপাসনা করিয়া ও তোষামোদ করিয়া তাঁহার অমোঘ ন্যায়

দণ্ডকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না,—তাঁহার বিচার অতি সূক্ষ্ম, তাঁহার দণ্ড অতি তীব্র, তাঁহার শাসন অতি কঠোর বলিয়া যাহার বিশ্বাস হয়, সে ব্যক্তি জানে পাপ কি ভয়ানক পদার্থ এবং অনুতাপের অনল কীদৃশ প্রখর ও দুঃসহ। কর্ম্মত্যাগী হওয়াতে আর্য্যঋষিগণ আত্মার স্বাধীনতা ও জীবনের গুরুতর দায়িত্ব সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে পারেন নাই; এজন্য পুরুষকারের ভাব তাঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুট হয় নাই; নির্ব্বন্ধ, অদৃষ্ট বা নিয়তির উপর আস্থা ও নির্ভর তাঁহাদের জীবনে নির্ব্বিবাদে প্রভুত্ব করিয়াছে। কর্ম্মক্ষেত্রেই আত্মার বল প্রকাশ পায়, কর্ম্মক্ষেত্রেই আত্মার কর্ত্তৃত্বশক্তি উপলব্ধি হয়। ধ্যানের রাজ্যে আত্মা সেই অন্তরাত্মার সঙ্গে মিশিয়া আত্মবিস্মৃত হয় এবং পুরুষকারের জ্যোতিঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু কর্ম্মপন্থী য়ীহুদা সাধকদিগের এ সমস্ত ভাব স্বোপার্জ্জিত সামগ্রী।

যেখানে লোকের ক্রমাগত উচ্চ ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, যেখানে কর্ম্মের উপর নিরবচ্ছিন্ন তাচ্ছিল্যভাব, সেখানে ঈশ্বরের বিশেষ করুণার উপর বিশ্বাসপাত হইতে পারে না,—সেখানে জীবন ও ইতিহাসের ঘটনাস্রোতে তাঁহার জীবন্ত সত্বা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না,—সেখানে অটলভাবে তাঁহার বিধানের উপর দৃষ্টি, বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন অসম্ভব হইয়া পড়ে,—সেখানে পাপ পুণ্যের গুরুত্ব ও প্রার্থনার আবশ্যকতা বোধ এবং কৃতাপরাধের জন্য অনুতাপ স্থান পায় না। ঊর্দ্ধনয়নে চাহিলে, আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ নিরীক্ষণ করা যায়, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের পদার্থজাত অদৃশ্য থাকে। ঊর্দ্ধস্থ ধ্যান-রাজ্যের প্রতি আর্য্যসন্তানগণের দৃষ্টি যে পরিমাণে আবদ্ধ ছিল, নিম্নস্থ কর্ম্ম-রাজ্যের সত্য-পুঞ্জ তাঁহাদের

দৃষ্টি হইতে সেই পরিমাণে অদৃশ্য ছিল। এই পক্ষপাত দৃষ্টি নিবন্ধন তাঁহারা ঈশ্বরের অব্যক্ত ও নির্গুণ ভাব মাত্র গ্রহণে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার ব্যক্ত ভাব, তাঁহার সগুণ ভাব গ্রহণ করিয়া সেই ভাবের নিকট শিক্ষালাভ ও সাধনা করিতে সমর্থ হন নাই। ধ্যানের উচ্চ ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত ভাবের শিক্ষা ও সাধনা হইবার কোন উপায় নাই। কেবলমাত্র কর্ম্মের নিম্ন ভূমিতে তাহার শিক্ষা ও সাধনা হইয়া থাকে। "অব্যক্ত ব্যক্ত রূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে"—ঐশ্বরিক এই সমগ্রভাব পৌরাণিক যুগেই উপলব্ধ হইয়াছিল। আর্য্যদিগের পৌরাণিক সময়ে তাঁহাদের দৃষ্টি এই ব্যক্ত ও সগুণ ভাবের দিকে কতকটা আকৃষ্ট হয়। এই পৌরাণিক সময়ে তাঁহারা প্রথম জানিতে পারিলেন যে, পরব্রহ্ম শুদ্ধ অব্যক্ত ও নির্গুণ নহেন, শুদ্ধ নির্লিপ্ত ও উদাসীন নহেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তরূপ ও গুণাত্মন্, সংলিপ্ত ও কর্ম্মশীল। ধ্যানচক্ষু কেবল ঐশ্বরিক প্রথম ভাবটী পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হন, তাঁহার অপর ভাবটীর প্রতি অন্ধ থাকেন। কর্ম্মচক্ষু কেবল দ্বিতীয় ভাবটী পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হন, তাঁহার প্রথম ভাবটীর প্রতি তাহা কখনও বিস্ফারিত হয় না। যখন এই দ্বিবিধ ভাবের সাধন মিলিত হইল,—যখন বৈদান্তিক ও পৌরাণিক যুগের একত্র মিলন হইল, তখনই আর্য্যেরা এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া ইষ্টপদে প্রণত হইলেন,—"অব্যক্ত ব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে, সমস্ত জগতাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ"।

এদিকে য়ীহুদা ঋষিরা তাঁহাদের বিশেষ ভাব কর্ম্মকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া ধর্ম্মতীর্থের যাত্রী হইয়াছিলেন। যৎকালে ভারত ঋষিরা দুরন্ত ব্রহ্মানুরাগে বহির্জ্জগৎকে তুচ্ছ করিয়া

অন্তর্জ্জগতের অভিমুখে মহাপ্রস্থান-পরায়ণ; য়ীহুদা ঋষিরা সে সময় অন্তর্জ্জগতের কোন সংবাদ আদৌ গ্রহণ না করিয়া, ইহ-সংসারে সুখধাম প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশে অনুরূপ অনুরাগে এক বিপদ-সঙ্কুল মহাযাত্রার অনুযাত্রী। তাঁহাদের ঈশ্বর ভারত-ঋষিদিগের ঈশ্বরের ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অন্তরের অন্তরতর অন্তরতম, অতীন্দ্রিয়,—অথচ প্রাণের প্রিয়তম পদার্থ নহেন; কিন্তু বহিশ্চক্ষুর বিষয়ীভূত, বহির্জ্জগতের পদার্থ বিশেষ, অন্তরের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই। তাঁহাদের ঈশ্বর ভারতঋষিদিগের পরব্রহ্মের ন্যায় অব্যক্ত, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় নহেন; কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সগুণ, ব্যক্ত ও অনুক্ষণ কর্ম্মলিপ্ত;—তিনি তাঁহাদের কর্ম্মের উৎসাহদাতা, এবং তাঁহাদের জীবনযাত্রার নেতা। তাঁহাদের ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ এবং আত্মার অন্তরাত্মা নহেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রাণ ও আত্মার বহির্দ্দেশে ব্যক্ত থাকিয়া তাঁহাদিগের শ্রবণ-পথে দৈববাণী প্রেরণ করিয়াছেন, এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উৎসাহ দান করিয়াছেন। তাঁহাদের ঈশ্বর নিষ্কাম ও মনোবৃত্তি বিহীন নহেন; কিন্তু তিনি বিবিধ প্রকার ভয়, মৈত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে নিজ ইচ্ছার বশবর্ত্তী করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, এবং স্বকীয় অভিলসিত পথে নীয়মান করিবার জন্য অশেষ প্রকারে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত-ঋষিদের যাত্রা অন্তর্পথে, সংসারের পর-পারে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামের অভিমুখে,—বহির্জ্জগতের দুস্তর চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অতিক্রম করিয়া আত্মস্থ হইবার দিকে। য়ীহুদা ঋষিদের যাত্রা তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত সুখধামের অভিমুখে,—সংসারে সুখময় স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিকে। এই সুখময়

শান্তিধাম লাভের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারা স্বজাতির আবাল বৃদ্ধ বনিতা লইয়া অর্দ্ধশতাব্দব্যাপী অতি উৎকট ও অলোকসাধ্য এক মহাযাত্রা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। য়ীহুদা-দিগের এই কার্য্যে আমরা কর্ম্মেরই মাহাত্ম্য দেখিতে পাই। কি অনুপম জীবন্ত কর্ম্মোৎসাহ! ভারতের আর্য্যজাতি প্রথম হই-তেই ধ্যানশীল; য়ীহুদা জাতি প্রথম হইতেই কর্ম্মশীল। ধ্যানে ভারতের আর্য্যজাতিকে এক স্থানে আবদ্ধ করিয়া অন্তর্পথে প্রেরণ করিয়াছে; কর্ম্মে য়ীহুদা জাতিকে প্রতিশ্রুত সুখধামের উদ্দেশে এই সংসার পথে দেশ হইতে দেশান্তরে পরিভ্রাম্যমান করিয়াছে। ধ্যানে ভারতের আর্য্যজাতিকে অন্তরস্থ, স্বধামস্থ হইবার জন্য কোন শ্রমকেই শ্রমজ্ঞান করিতে দেয় নাই; কর্ম্মে য়ীহুদাজাতিকে সংসারে সুখধাম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কোন প্রকার কষ্টকেই কষ্ট জ্ঞান করিতে দেয় নাই। ধ্যানে ভারতের আর্য্যজাতিকে প্রথম হইতেই অন্তর্ম্মুখ,—ব্রহ্মাভিমুখ, করিয়াছে; কর্ম্মে য়ীহুদাজাতিকে প্রথম হইতেই বহির্ম্মুখ,—সংসারাভিমুখ করিয়াছে। ধ্যানে ভারতের আর্য্যদিগকে ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ আবি-ষ্কার করিতে শিক্ষা দিয়াছে; কর্ম্মে য়ীহুদা জাতিকে ধর্ম্মের বহিরঙ্গ সাধন করিতে নিযুক্ত করিয়াছে। ভারতের আর্য্যেরা অন্তরঙ্গে অপূর্ব্ব ধর্ম্মমার্গ,—স্বধামস্থ হইবার সুন্দর পথ, ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিবার প্রশস্ত সাধন আবিষ্কার করিয়া পৃথিবীকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন; য়ীহুদার সাধুরা বহিরঙ্গে অপূর্ব্ব নীতিমার্গ,—সংসারে স্বর্গের ছবি অবতারণা করিবার সুন্দর পথ প্রদর্শন করিয়া জগৎকে চমকিত করিয়াছেন। ভারতের ঋষিরা ধ্যান-প্রসূত অদ্ভুত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল উপলব্ধি করিয়া তত্ত্ব-

প্রধান বেদান্তাদি শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন; য়ীহুদার ঋষিরা কর্ম্ম-প্রসূত সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া স্বজাতির কর্ম্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিহাস-প্রধান বাইবেল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

য়ীহুদা জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিতত্ত্বের অতি সুন্দর প্রস্রবণ হইলেও, ইহাকে অবশ্যই পৌরাণিক বলিতে হইবে। ধ্যান-বীজ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কর্ম্মবীজ হইতে পৌরাণিক ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যেও পৌরাণিক ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু তাহা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব নহে; তাহা "অনাত্ম শাস্ত্র" মধ্যে গণনীয়,—অধিকারী বিশেষের জন্য তাহার আবশ্যকতা স্বীকৃত হইত। তাঁহাদের এই পৌরাণিক ধর্ম্মও ব্রহ্মজ্ঞান এবং উপনিষদ্-মূলক। এবং এই পৌরাণিক ধর্ম্মের নীতিতত্ত্বও য়ীহুদীয় ও খৃষ্টীয় নীতিতত্ত্ব অপেক্ষা কিছুতেই নিকৃষ্ট নহে। এদিকে য়ীহুদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানাত্মক নহে; তাহা পৌরাণিক হইলেও ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্মের ন্যায়, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পূর্ণ নহে। তবে তাহার যে এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব আছে, তাহা আর কোথাও দৃষ্ট হয় না;—তাহা এই দুঃখ ও অশান্তিময় পৃথিবীকে স্বর্গীয় সুখধামে পরিণত করা;—পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করা। ভারতীয় আর্য্যদের নীতিশাস্ত্র অপেক্ষা য়ীহুদীয় ও খৃষ্টীয় নীতির শ্রেষ্ঠত্ব কেবল এখানে, ইহাঁদের পৌরাণিক ধর্ম্মের মহত্ত্ব কেবল এই প্রশস্ত ক্ষেত্রে। লোকে যে য়ীহুদীয় ও খৃষ্টীয় নীতিশাস্ত্রকে এত ভক্তি করে, তাহা এইজন্য যে, ইহা কেবল নিজের উন্নতির বা পরিত্রাণ সাধনের জন্য নহে;—ইহা সমগ্র জাতি, সমগ্র পৃথিবীর

নরনারীকে, কেবল পরলোকে নহে, কিন্তু ইহলোকেও উন্নত করিয়া স্বর্গীয় সুখ শান্তির অধিকারী করিবার জন্য। এই নীতি-শাস্ত্র কেবল নিজের পরিত্রাণ সাধন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে দেয় না, অপরের—সকলের পরিত্রাণ সাধনে সহায়তা করিতে জ্বলন্ত উৎসাহে উৎসাহী করে। এই জন্যই ইহাকে জীবন্ত নীতিশাস্ত্র বলিয়া গণনা করা যায়। ইহা নির্জ্জীব মানুষকে জীবন দিতে পারে। ভারতের পৌরাণিক নীতিশাস্ত্র এ বিষয়ে ইহা অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভারতের পৌরাণিক শাস্ত্র কতকগুলি নিস্তেজ নির্জ্জীব শান্ত প্রকৃতি সমুৎপন্ন করিয়াছে; কিন্তু য়ীহুদীয় ও খৃষ্টীয় পৌরাণিক ধর্ম্ম জীবন্ত জ্বলন্ত ধর্ম্মবীরদিগকে মুর্ত্তিমান করিয়া জগৎকে উপকৃত করিয়াছে এবং আজিও করিতেছে। যদি য়ীহুদীয় ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মবীরদিগের উপার্জ্জিত ও আবিষ্কৃত সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব বিলুপ্ত হয়, তথাপি পৃথিবীতে ইহাদের পৌরাণিক ধর্ম্মমূলক এই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার ভাব মানব-প্রকৃতি হইতে কখনই বিলুপ্ত হইবে না। কর্ম্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া য়ীহুদীয় ও খৃষ্টীয় সাধুরা এই মহৎ ভাব প্রসব করিয়াছিলেন। ইহা কর্ম্মবৃক্ষের সর্ব্বোত্তম ফল। ইহা ধ্যান-বৃক্ষে কখনই ফলিবার প্রত্যাশা নাই। কর্ম্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া য়ীহুদীয় স্রোত যে কেবল ঈশ্বর প্রতিশ্রুত আরামস্থান লাভ করিবার জন্য মিসরদেশ হইতে কৈনান পর্য্যন্ত আসিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; পৃথিবীকে স্বর্গধাম করিবার জন্য তাঁহাদের মহাযাত্রার আজিও বিরাম হয় নাই। তাঁহাদের ঈশ্বর প্রতিশ্রুত সুখধাম উদ্দেশে তাঁহাদের মহাপ্রস্থানের আজিও 'বিজয়া' হয় নাই। তাঁহাদের কৈনান লাভ করিবার পর হইতে

তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের শ্রুত দৈববাণীর নূতন অর্থ তাঁহাদের শুভ বুদ্ধিতে উদয় হইতে লাগিল। তাঁহারা ক্রমেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের প্রতিশ্রুত কৈনান কোন প্রদেশ-বিশেষ নহে, তাহা সংসারে স্বর্গধামের অবতারণা করা; অন্তরে ঈশ্বর-ভক্ত দেব সমাজের যে ছবি আছে, মনুষ্য সমাজের মধ্যে তাহার প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করা। সে জন্য পর্ব্বত, পাথার, অরণ্য ও বালুকা ভূমি অতিক্রম করিতে হয় না, কেবল নরনারীর হিত-ব্রতে জীবনকে উৎসর্গ করিতে হয়, জন সমাজকে স্বর্গের দিকে উত্তোলন করিতে হয়। সে জন্য কেবল ভূভার ধারণক্ষম হইলে চলে না, সে-জন্য ভূভার উত্তোলনক্ষম হওয়া চাই। য়ীহুদীয় স্রোতের খৃষ্টীয় শাখার এত বল ও এত তেজ, এই জন্যই। তাঁহারা স্বকীয় মস্তকে এই গুরুতর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়া মহাভারে ভারাক্রান্ত। মর্ত্ত্য-ধামকে স্বর্গের দিকে উত্তোলন করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে কত তেজ, কত বলের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে! তজ্জন্য তাঁহারা কত কষ্ট, কত শ্রম, কত উৎপীড়ন অঙ্গীকার করিয়া জগৎকে স্তব্ধ ও চমকিত করিয়া রাখিয়াছেন! তজ্জন্য তাঁহাদের মহাযাত্রার (Exodus এর) স্রোত আজিও প্রবল বেগে প্রবহমান রহিয়াছে,—যেরূপ প্রবল বেগে মহর্ষি মূষা ও যস্থ্যার সময় সে স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহা য়ীহুদীয় ধর্ম্মের শেষ পরিণাম। যত কাল নরনারীর আত্মা এ সংসারে দেহস্থ থাকিবে, ততকাল এই মহাযাত্রার স্রোত ইহসংসারে প্রবহমান থাকিবে; তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পৃথিবীতে এখন যে কোন যুগধর্ম্ম সমুৎপন্ন হইয়াছে বা হইবে, সেই সেই ধর্ম্মকে য়ীহুদী জাতি প্রবর্ত্তিত এই মহাযাত্রার অনু-

যাত্রী হইতে হইবে; নচেৎ তাহাদিগের এ সংসারে অভ্যুদয় লাভ সম্ভাবিত হইবে না। ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণকেও এ বিষয়ে য়ীহুদীয় ও খৃষ্টীয় সাধুদের অনুসরণ করিতে হইবে, নচেৎ তাঁহাদিগেরও এ সংসারে দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইবে। মর্ত্ত্যে স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠার যে সমীচীন ভাব, ইহা য়ীহুদীয় ও খৃষ্টীয় পৌরাণিক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই ভাব খৃষ্টীয় নীতির প্রবর্ত্তক হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, ও দেশ বিদেশে বিস্তার লাভ করিতেছে; ভারতীয় পৌরাণিক ধর্ম্ম অধিকাংশ স্থলে ইহলৌকিক তুচ্ছ সুখের লোভ ও দুঃখের ভয় দেখাইয়া লোককে ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে; প্রত্যেক নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের পশ্চাতে সুদীর্ঘ ফলশ্রুতি যুক্ত ও গ্রন্থিত করিয়া রাখা হইয়াছে, এক্ষণে উপদেষ্টা ও উপদিষ্টের মধ্যে অতি অল্প লোকেই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন কোন স্থলে ভারতীয় কর্ম্ম সাধকদিগের মধ্যে অতি অপূর্ব্ব এক নিষ্কাম কর্ম্ম যোগের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। য়ীহুদীয় কর্ম্ম যোগীরা যে ভাবে কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই অনেকটা রাজসিক ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে; কিন্তু শুদ্ধ সাত্ত্বিকী ভাবে ফলকাম বিরহিত হইয়া কর্ম্মফল ঈশ্বর চরণে সমর্পণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন কেবল ভারতীয় কর্ম্মসাধকদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এরূপ ভাবে আত্মা কৃতার্থ হয়, কিন্তু সেই কর্ম্ম সাধনে সেই মহাশক্তি স্ফূর্ত্তির সংঘটনা হয় না,—যে শক্তি পৃথিবীকে স্বর্গের দিকে উত্তোলন করিতে সমর্থ হয়। সাত্ত্বিকী প্রশান্ত শক্তিতে সে সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহা

শান্তিপূর্ণ, সুমধুর এবং আত্মার পক্ষে অধিকতর কল্যাণ-কর।

কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া য়ীহুদীয় সাধুরা আর একটী অমৃত ফল উপার্জ্জন করিয়াছলেন,—সেটী একটী ক্রিয়াবান ধর্ম্মবীরের আদর্শ লাভ এবং সেই আদর্শের অনুরূপ সুন্দর জীবন লাভ। তাঁহাদের কৈনান যাত্রারও বহুপূর্ব্ব হইতে তাঁহারা সেই আদর্শ পুরুষের ছবি মনোমধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা সেই সময় হইতে তাঁহাদের ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত এই প্রত্যাশাকে হৃদয়ে স্থান দান করিয়া আসিয়াছেন যে, তাঁহাদের অন্তর্পোষিত সেই আদর্শ সময়ে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাদের স্বজাতির মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন, এবং স্বকীয় প্রভাব ও দৃষ্টান্তে তাঁহাদের বংশধর গণের মধ্যে স্বর্গের সুখশান্তি আনয়ন করিবেন, এবং তাঁহাদিগকে পরিত্রাণের সুন্দর পথ দেখাইয়া স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবেন। পৃথিবীর অন্য কোন জাতিকে এরূপ মহান্ আদর্শ পোষণ করিতে দেখা যায় নাই।

বহুকাল হইতে এই সুন্দর আদর্শ সমগ্র য়ীহুদীয় জাতির গর্ভকোষে বিশ্বাস ও যত্নের সহিত পোষিত হওয়াতে সময়ে সময়ে অতি সুন্দর ফলও প্রসূত হইয়াছে। সেই বিশ্বাস ও যত্নপোষিত আদর্শবীজ হইতে প্রভু যীশুখৃষ্ট ও তাঁহার পূর্ব্বপরবর্ত্তী বহুতর সাধুসজ্জন,--বহুতর ধর্ম্মবীর উৎপন্ন হইয়াছেন। য়ীহুদীয় খৃষ্টীয় শাখা খৃষ্ট চরিত্রে পূর্ব্বপোষিত সেই আদর্শ দেখিয়া, পূর্ব্বপুরুষ দিগের ন্যায় সেই আদর্শ পোষণে ক্ষান্ত হইয়াছেন; কিন্তু খৃষ্টের পুনরাবর্ত্তনের মত ও খৃষ্ট চরিত্রের আরাধনা তাঁহাদের বিশ্বাস ক্ষেত্রে স্থল প্রাপ্ত হওয়াতে, তাঁহারা

একভাবে সেই আদর্শ পোষণে এখনও অনুরক্ত রহি-য়াছেন।

ধ্যান্য-মন্ত্রে দীক্ষিত দিগের অন্তরে এরূপ ঐতিহাসিক জীবনের আদর্শ উদয় হইবার পথ পায় না। ধ্যান-রাজ্যে ঈশ্বর ও সাধকের মধ্যে ব্যবধান কোথায়? কোনও মধ্যবর্ত্তী আদর্শের দাঁড়াইবার স্থল কোথা? সেখানে পরস্পরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ,সেখানে পরস্পর পরস্পরের অব্যবহিত সন্নিধানে, সেখানে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সেখানে নদী ও জলধিতে মিশিয়া একাকার। কর্ম্মক্ষেত্রে কিন্তু ঈশ্বর ও সাধকের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। সে ব্যবধানের কিছুতেই হ্রাস বা তিরোভাব হইবার প্রত্যাশা নাই। সেখানে কাহার সাধ্য সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শকে হৃদয়ে অনুভব করে, অঙ্কিত করে? কাহার সাধ্য সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শকে হৃদয়ে আনয়ন ও ধারণ করে? কর্ম্মক্ষেত্রে সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শকে জীবনের আদর্শ করিতে গেলে একটী মধ্যবর্ত্তী আদর্শ-ছায়া আমাদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির গোচরে আসিয়া উপস্থিত হইবেই হইবে। এই মধ্যবর্ত্তী আদর্শ ছায়াকে দূরপরাহত করা অসাধ্য ও অসম্ভব। সেই ছায়া আমাদের দৃষ্টির অন্তরায় হইয়া সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শকে আচ্ছাদন করিবেই করিবে। অনন্ত আকাশের পানে চাও, তাহাকে কেহ কখনও দৃষ্টির আয়ত্ত করিতে পারিবে না; একটী দৃশ্যমান কল্পিত সীমা, যাহাকে "sensible horizon" বলে, নিশ্চয়ই আমাদের দৃষ্টি পথের অতিথি হইয়া অনন্ত আকাশকে আচ্ছাদন করিবেই করিবে। ইহা অপরিহার্য্য। কিন্তু ইহাতে পরিতাপের কারণ কিছুই নাই। সেই

দৃশ্যমান কল্পিত সীমা, সেই "sensible horizon" অনন্ত আকাশকে ঢাকে বটে, কিন্তু তাহাতে পর্য্যটকের পথ পর্য্যটনের যথেষ্ট সাহায্য হয়। সেই কল্পিত সীমা দেখিয়া পরিব্রাজক মনে করেন যে, সেই সীমান্তে তাঁহার পর্য্যটনের অবসান হইবে। এই চিন্তা পর্য্যটকের উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত রাখে। কিন্তু পরিব্রাজক যতই সেই সীমান্তের দিকে অগ্রবর্ত্তী হইতে থাকেন, সেই দৃশ্যমান সীমান্তদেশ সেই পরিমাণে দূরবর্ত্তী হইয়া তন্নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য পূর্ব্ববৎ প্রতিনিয়ত পরিব্রাজককে আহ্বান করিতে থাকে। তদ্রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শের অভিমুখীন হইলে একটী কল্পিত আদর্শ মধ্যবর্ত্তী হইয়া সাধকের কর্ম্মপথে উদিত হয় এবং সাধককে তৎসমীপবর্ত্তী হইবার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ করিতে থাকে,—যেন সেই স্থানেই তাঁহার সাধনের শান্তি ও পর্য্যাপ্তি। কিন্তু বস্তুতঃ সাধক যতই কল্পিত মধ্যবর্ত্তী আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন, তাহা ততই দূরবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিনিয়ত সাধককে তৎসন্নিধানে আহ্বান করিতে থাকে।

বাহিরের আকাশের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে যে মধ্যস্থিত কল্পিত সীমান্ত দেশ নেত্রপথে উপস্থিত হয়, তাহা আর কিছুই নহে; কেবল অনন্ত আকাশের যতটুকু আমরা আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টির আয়ত্ত করিতে পারি,—তাহা পরিমিত হইলেও অনন্ত আকাশের সঙ্গে অভেদ। কর্ম্মক্ষেত্রে অনন্ত পূর্ণ আদর্শের পানে তাকাইলে যে মধ্যবর্ত্তী কল্পিত আদর্শ অনুভূত হয়, তাহাও আর কিছুই নহে, কেবল সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শের যতটুকু আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা আয়ত্তীকৃত করিতে পারি। তাহা সেই

অব্যক্ত পূর্ণ আদর্শের ব্যক্ত ভাব,—তাহা পরিমিত হইলেও সেই অনন্ত পূর্ণ আদর্শের সঙ্গে অভেদ;—অভেদ হইলেও তাহা পুত্ররূপী, ভক্তরূপী, মনুষ্যরূপী।

খৃষ্ট জগতের এই পুত্ররূপ, ভক্তরূপ, মনুষ্যরূপ,—ইহা সেই নিরঞ্জন অব্যক্ত পুরুষের ব্যক্তরূপ,—সেই গুণাতীত নির্গুণ পুরুষের সগুণরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজম্ ব্রহ্ম নিষ্কলম্"—পঞ্চ কোষাতীত তুরীয় হিরণ্ময় পরম কোষে সেই নিরঞ্জন অব্যক্ত পুরুষ বিরাজ করেন। কিন্তু এই "ব্যক্তরূপ" এই গুণাত্মরূপ"—এই আদর্শ মূর্ত্তি বিজ্ঞানময় কোষেই অনুভূত হইয়া থাকে। হিরণ্ময় পরম কোষস্থ সেই অব্যক্ত পরম পুরুষের ছায়া বিজ্ঞানময় কোষে আসিয়া কর্ম্মপথের যাত্রীদিগের নিকট ব্যক্তিরূপে এই ভাবে ব্যক্ত হইয়া থাকে। আর্য্য ঋষিরা ধ্যানের উচ্চক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকাতে তাঁহাদের অধ্যাত্ম দৃষ্টি বিজ্ঞানময় কোষের অনেক উপর দিয়া পরিচালিত হইয়া অব্যক্ত নির্গুণধামের অভিমুখে বিস্ফারিত থাকাতে, এই ব্যক্তরূপ তাঁহাদের দ্বারা পরিলক্ষিত হইতে পারে নাই। ইহা কেবল কর্ম্ম যোগী ইহুদা ঋষিদিগের দ্বারাই পরিদর্শিত ও সযত্নে প্রতিপোষিত হইয়াছিল। পৌরাণিক সময়ের ভারতীয় কর্ম্মযোগীরা, সেই অব্যক্তের "ব্যক্তরূপ"—সেই নির্গুণের সগুণভাব উপলব্ধি করিতে শক্ত হইয়াও, য়ীহুদদিগের সহজাত ও সযত্ন-পোষিত কর্ম্মভাবের এই বিশেষত্বের অসদ্ভাব হেতু এই কর্ম্মক্ষেত্রে তাদৃশ সূক্ষ্মদর্শী হইতে পারেন নাই; সুতরাং য়ীহুদা জাতি লব্ধ কর্ম্ম-যোগের সত্যপুঞ্জ ইহাঁদিগের লক্ষ্য পথে তাদৃশ সুস্পষ্ট উপস্থিত হয় নাই। য়ীহুদাজাতিলব্ধ এই আদর্শমূর্ত্তি ভারতীয় পৌরা-

নিক ঋষিদিগের অনভ্যস্ত চক্ষে তাদৃশ অভিব্যক্ত হয় নাই।

য়ীহুদীয় কর্ম্মবৃক্ষের আর একটী ফল খৃষ্টীয় ঐশ্বরিক Trinity বা ত্রিত্ববাদ। ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ সংস্থানের স্ফূর্ত্তি কেবল খৃষ্টীয় সমাজে কেন, ভারতের আর্য্যসাধকগণ মধ্যেও অতি সুন্দরও সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়াছিল। তবে খ্রীষ্টীয় সমাজে তাহা যেমন একটী বিশেষ মত (Dogma) হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে আর্য্য-সমাজ মধ্যে তাহা কখনও সেভাবে দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। বস্তুতঃ ইহা সাধারণ্যে প্রচারিত হইবার বিষয় নহে। ইহা সাধকবৃন্দের অতি গুহ্য অনুভব্য ও আরাধ্য বিষয়। খ্রীষ্টীয় সমাজের পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা পৌরাণিক ঋষিদিগের "ব্রহ্ম, ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মণ্যদেব," এবং ভাগবৎ শাস্ত্রোক্ত, "ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দতে"—"ব্রহ্ম, ভগবান ও পরমাত্মা" তিন স্থলেরই ত্রিত্ববাদ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে,—তদ্দ্বারা একই বস্তুকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই তিন স্থলেই একেরই ত্রিবিধ সংস্থান,—একেরই ত্রিবিধ আধারে প্রতিষ্ঠা বিবৃত হইয়াছে। তবে এই ত্রিবিধ স্থলে এই প্রতিষ্ঠাত্রয়ের অনুভূতির কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ ও তারতম্য থাকিতে পারে। খ্রীষ্টীয় সমাজের পিতা, পৌরাণিক আর্য্য ও ভাগবৎ বৈষ্ণব সাধকদিগের ব্রহ্ম একই ব্যক্তি, অর্থাৎ নির্লিপ্ত ও অব্যক্ত ব্রহ্ম। খৃষ্টীয় সমাজের পবিত্রাত্মা, পৌরাণিক আর্য্য সাধকদিগের ব্রহ্মণ্যদেব এবং ভাগবৎ বৈষ্ণবদিগের "পরমাত্মা" একই বস্তু, অর্থাৎ অন্তরে আবিভূত অনুপ্রাণিত ব্রহ্মসত্বা। এবং খৃষ্টীয় সমাজের পুত্র, পৌরাণিক আর্য্য সাধকদের

'ব্রাহ্মণ' এবং ভাগবত বৈষ্ণবদিগের 'ভগবান' একই পদার্থ অর্থাৎ মানুষে অভিব্যক্ত---প্রমুক্তভাবে অভিব্যক্ত পরমেশ্বরের পরম সত্ত্বা।' নির্লিপ্ত ব্রহ্ম God in himself কে খৃষ্টীয় সমাজ পিতা শব্দে উক্ত করিয়াছেন। এই নির্লিপ্ত পুরুষ যখন অনুরক্ত ভক্তের দিকে অবনত হন—ঢলিয়া পড়েন,—যখন নির্ম্মল মাধুর্য্য আবির্ভাব বা শক্তিরূপে, বিশুদ্ধ বিবেক বা শুভ বুদ্ধিরূপে, সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপে সাধকের প্রাণে সঞ্চারিত ও প্রকাশিত হন। তখন এই divine guest কে, পরম অতিথিকে পবিত্রাত্মা "ব্রহ্মণ্যদেব" বা "পরমাত্মা" শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই ভাবে প্রাগুক্ত নির্লিপ্ত অব্যক্ত পরম পুরুষ সাধকের সঙ্গে আসিয়া সংলিপ্ত হন, সাধকের নেত্রপথে আসিয়া অভিব্যক্ত হন এবং প্রেমলীলা, ভক্তিলীলা উদ্‌যাপন করিবার সূত্রপাত করেন এবং ভক্তদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিবিধ কার্য্য সম্পাদন করেন। এই অবতারণার দ্বারা যসই নির্ম্মল পরমব্রহ্মের —সেই অরূপের রূপ, ভাব, মাধুর্য্য ও শক্তি ভক্ত ও সাধকদেহে অভিব্যক্ত হইয়া, ইহসংসারে সেই পরম তূরীয় ফুলের শোভা ও সৌরভ বিকাশ করিয়া জনগণের প্রাণাকর্ষণ করিতে থাকে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠা সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ হস্ত স্বরূপ। এই হস্তদ্বারা তিনি একদিকে অনুগতজনের জীবত্ব —আত্মভাব—হরণ কবিবার চেষ্টা করেন, এবং অপর দিকে সেই অনুগতজনের পার্শ্ববর্ত্তী জনগণকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করেন,—তাহাদিগকে আকর্ষণ ও স্বেচ্ছাধীন করিবার প্রয়াস পান। এরূপ করিবার উদ্দেশ্য,—দুর্ভাগ্য জীবকে ভুলাইয়া, অশেষ দোষের আকর তাহার জীবত্ব বস্তুটী হরণ

পূর্ব্বক নিজে সেই পরিত্যক্ত দেহটী নিজস্ব রূপে স্বতন্ত্ররূপে অধিকার করিয়া, ইহ সংসারে নরলীলার স্রোত রক্ষা করা। ইনি সেইজন্য ভিখারির বেশে দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া থাকেন; ভিক্ষার বিষয়, দেহের মধ্যে একটু স্থান লাভ, —বসিবার— দাঁড়াইবার— কার্য্য করিবার স্থান লাভ। দেহের মধ্যে দুইজনের স্থান নাই; যদি সেখানে ব্রহ্মের আবির্ভাব হয়, অন্ততঃ তৎকালে জীবকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়; সেখানে জীব থাকিলে ব্রহ্মের থাকিবার স্থান সঙ্কুলন হয় না, সেখানে ব্রহ্ম সত্বা অতিথি হইলে জীবেরও থাকিবার স্থান কুলায় না। "Our heart its scanctiness is such that it cannot bear the conflict of two rival tides."(Madam Guyan)। এখন কে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া,— আপনার জীবত্ব ধনটী নষ্ট করিয়া এই পরম অতিথিকে, এই দীন হীন ভিখারিকে আপন ঘর নিজস্বরূপে নিঃস্বত্বে ছাড়িয়া দিবে? প্রকৃত ধর্ম্মার্থীর ইহা জানা উচিত যে, তিনি সাধ করিয়া আপন মৃত্যু ফাঁস আপন গলদেশে দিয়া টানিবার আয়োজন করিতেছেন; আপনার ঘর বাড়ী যথাসর্ব্বস্ব ব্রহ্মপদে সমর্পণ করিয়া আত্মনাশের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। প্রকৃত ধর্ম্ম সাধন শুদ্ধ এই স্বকৃত মৃত্যুর আয়োজন ও চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে,— প্রকৃত সিদ্ধি লাভ শুদ্ধ এই আত্মহত্যা সাধনমাত্র। এই পরম অতিথি প্রথমতঃ নিষ্ঠারূপে, শ্রদ্ধাভক্তিরূপে, আস্থা ও বিশ্বাস রূপে, বিবেক ও বৈরাগ্যরূপে সাধকের প্রাণে উদয় হন, ক্রমে আপনার নির্ম্মল স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন। য়ীহুদা দেশে যে প্রাগুক্ত আদর্শ পুরুষের-প্রতিকৃতি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল, তাহা এই পরম অতিথির দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং ভারতে যে

নিষ্কাম কর্ম্মযোগের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারও মূল ইনি। উভয়ত্রই তাঁহার প্রতিকৃতি-বিশেষ সাধক-নেত্রে প্রতিভাত হইয়াছিল।

আর পুত্র যিনি, ব্রাহ্মণ যিনি, ভগবান্ যিনি, তাঁহার প্রতিষ্ঠা কোথায়? তাঁহার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে, স্বতন্ত্র ও নিজস্ব রূপে অধিকৃত এই জীবত্ব-পরিভ্রষ্ট জীবদেহে। যেখানে জীবের জীবত্ব, মানুষের আত্মভাব সম্পূর্ণরূপে নিহত, নিষ্কাসিত বা অভিভূত,—যেখানে জীবের পূর্ব্ব বাসস্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে, যেখানে দেহের মধ্যে যে অহংঅভিমান বিশিষ্ট এক 'আমি' ছিল, তাহার আমিত্ব, স্বামীত্ব, কর্ত্তৃত্ব সকলই কোথায় তিরোহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'আমি' ও 'আমার' বলিবার কিছুই নাই, সেখানেই সেই পরম প্রভুর প্রভুত্ব, স্বামীত্ব ও কর্ত্তৃত্ব এবং আবির্ভাব ও সত্ত্বা স্বতঃই প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে; সেখানে 'পবিত্রাত্মা' 'ব্রহ্মণ্যদেব' বা "পরমাত্মা" দেহ বিশিষ্ট হইয়া, ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়া নরলীলা উদ্‌যাপন করিতে বসেন। এখানে সেই নির্লিপ্ত অব্যক্ত পুরুষ নরদেহ মধ্যে ব্যক্তিরূপে অভিব্যক্ত—সেই নির্গুণ পুরুষ "গুণাত্মন" হইয়া স্বপ্রকাশ। এখানে সেই হিরণ্ময় পরম কোষের পরম পুরুষ মানুষরূপে লীলাপর,—এখানে তাঁহার যাবতীয় লীলার মধ্যে "সর্ব্বোত্তম" যে "নরলীলা,", তাহা অবাধে সম্পন্ন হইতে থাকে। যেখানে দেহবাসী জীবের ঘর পূর্ব্বোক্তরূপে শূন্য হয়, এই ঘরে সেই পরম বস্তু আসিয়া পূর্ণ করেন,—সেই ঘর তিনি আলো করিয়া বসেন। দেহ মধ্যস্থ জীবের এই ভাবে পরিত্যক্ত ঘর কদাপি শূন্য পড়িয়া থাকে না, তাহা এইরূপে নিত্যকাল পূর্ণ হইয়া আসিতেছে।

এখানে তিনি স্বয়ং দেহবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট ও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট। তিনি চিরকাল এই ভাবে ভক্তকে নিহত করিয়া তাহার পরিত্যক্ত ঘর নিঃস্বত্বে অধিকার করিয়া, ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রেমলীলার নিত্য প্রবাহ রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ইতিহাস এ সুসংবাদ প্রাপ্ত হয় না, সাধারণে এ সুসমাচার প্রাপ্ত হয় না,—কেবল প্রাণার্পণ-ক্ষম জীয়ন্তে মরণ-ক্ষম ভগবদ্ভক্ত জনেই তাহার সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন।

ভক্তদেহে পুত্ররূপে, ব্রাহ্মণরূপে বা ভগবানরূপে অবতারণার কথা উপরে যাহা উল্লেখিত হইল, তাহাতে সেই পরমপুরুষের মায়িক ঐশ্বর্য্য বিকাশের কোন কথাই নাই। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন সে বিকাশের কোন সম্ভাবনা হয় না। সেই পরম পুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তার বিকাশ একপ দেহে সচরাচর সম্ভাবিত হয় না। সেই পরম পুরুষ যখন ভক্ত উপাসকের প্রাণে আসিয়া প্রকাশিত হন, তখন সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিবর্জ্জিত হইয়া, শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবে—দীন হীন কাঙ্গালীর বেশে উপস্থিত হন। কাঙ্গাল ভক্তের ভগবানকে কাঙ্গাল বেশে অভিব্যক্ত হইতে হয়---"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং" তাঁহার ঐশ্বর্য্যভাব তখন ভক্ত সংসর্গে স্বতঃই খসিয়া পড়ে। রাজা শাসনদণ্ড লইয়া বিদ্রোহী প্রজার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রণয়োন্মুখ হইয়া যখন রাজমহিষীর সন্নিধানে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার স্বতন্ত্র ভাব—তখন তাঁহার স্বতন্ত্র বেশ। সে রাজ-বেশ সেখানে আপনা-আপনি তিরোহিত হয়। সেখানে তাঁহার রাজদণ্ড হস্ত হইতে আপনা-আপনি খসিয়া পড়ে। যেখানে তিনি একটু স্থানভিক্ষার্থী হইয়া আসিতেছেন,

সেখানে ষড়ৈশ্বর্য্য আসিলে চলিবে কেন? সুতরাং পুত্র যিনি, ব্রাহ্মণ যিনি, ভগবান যিনি, তিনি সচরাচর ষড়ৈশ্বর্য্যহীন হইয়া, ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া লীলাপর হন; এই জন্য ইতি-হাসে সে লীলার আদ্যন্ত বর্ণিত হয় না, জগৎ তাহার বড় একটা সংবাদ রাখে না। যেখানে তিনি ঐশ্বর্য্য মিশ্রিত হইয়া যুগধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ অভিব্যক্ত হন, সেখানে ইতিহাস তাঁহার লীলা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়,—ভাগবতে তাঁহার চরিতামৃত গান করিয়া থাকে।

যখন যীশুর দেহস্থ জীব—আত্মভাব—ক্রুশ-হত হইয়া মরি-লেন, তখন সেই দেহের শূন্যস্থান পবিত্রাত্মা আসিয়া পরিপূর্ণ করিলেন। তজ্জন্য যীশু মরিয়াও পবিত্রাত্মা সহযোগে জীবন্ত হইয়া পুনরুত্থিত হইলেন। পূর্ব্বের সে যীশু আর নাই; তুমি এখন যে যীশুকে দেখিতেছ, তিনি পবিত্রাত্মা;—যদিও যীশুর শবদেহ অধিকার করিয়া,—যীশুর বাহ্যাবরণে আবৃত হইয়া, ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া যীশু নামে পরিচিত হইয়া লীলাপরবশ হইয়াছেন।

এই নির্লিপ্ত ব্রহ্ম Father, God in himself মানুষের মধ্যে, অভক্ত সাধক মধ্যে প্রথমতঃ Divine Visitor or guest —ব্রহ্মণ্যদেব, পবিত্রাত্মা বা পরমাত্মারূপে সঞ্চারিত বা অনু-প্রাণিত হইয়া,—অনুপ্রবিষ্ট হইয়া লীলা করিতে লাগিলেন। এই

লীলার শেষ পরিণাম,—জীবের সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ, আমি-র সম্পূর্ণরূপে আমত্ব বিসর্জ্জন,—জীব এক এক করিয়া আপনার সমস্ত দুর্গ ব্রহ্মণ্য-দেবকে অধিকার করিতে দিয়া অবশেষে স্বকীয় মলিন চৈতন্য লইয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। যাই জীব স্বকীয় চৈতন্য লইয়া সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিলেন, অমনি পবিত্রাত্মা, ব্রহ্মণ্যদেব বা পরমাত্মা তৎস্থান নিঃস্বত্বে অধিকার করিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লীলাপর হইলেন। এখানে সাধকেরা ব্রহ্মেরই নরলীলা মূর্ত্তিমান দেখিতে পান, God in himsilfকে প্রথমতঃ Divine Visitor বা guest রূপে প্রাণের মধ্যে দেখিতে পাইলেন; পরে তাঁহাকে God in man দেখিয়া অবাক্ ও কৃতার্থ হইলেন।

এই ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠার মধ্যে ব্রহ্ম যিনি,—পিতা যিনি, তিনি কেবল ধ্যানপরায়ণ জ্ঞানীগণেরই ধেয় বস্তু,—ধ্যান-যোগীরা তাঁহাদের ধ্যাননেত্রে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আর পবিত্রাত্মা যিনি, পরমাত্মা যিনি, ব্রহ্মণ্যদেব যিনি,—তিনি কেবল প্রক্রিয়ানিষ্ঠ ও কর্ম্মপন্থী যোগীদিগেরই আরাধ্য বস্তু। তাঁহারা না মূলাধার ব্রহ্ম সত্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে চান,—না পুত্রকে, ব্রাহ্মণকে, ভগবান্‌কে ধরিতে পারেন। অন্তরের আবির্ভাব লইয়াই তাঁহাদের চলা ফেরা। তাঁহাদের যোগ-দৃষ্টি কেবল অন্তর মধ্যেই পরিক্রমণ করে। আর পুত্র যিনি,

ব্রাহ্মণ যিনি, ভগবান যিনি,—তিনি কেবল শুদ্ধ ভক্তদিগেরই সাক্ষাৎ পরমারাধ্য বস্তু। তাঁহারা কেবল তাঁহার দিকেই আকৃষ্ট, তাঁহারই সহচর, অনুচর ও পার্শ্বদ হইবার প্রয়াসী,—তাঁহারই সঙ্গে থাকিয়া অপূর্ব্ব রূপমাধুরী, বেণু-(স্বর)-মাধুরী, ও লীলা-মাধুরী সম্ভোগ করিয়া থাকেন; সর্ব্বত্র তাঁহারই প্রেম-লীলার,—ভক্তি লীলার সহায় হইয়া থাকেন। তাঁহারা অবশ্যই পবিত্রাত্মাকে, পরমাত্মাকে, ব্রহ্মণ্যদেবকে হৃদয়দেশে পূর্ণ দেখিতে পান; কিন্তু তাঁহাদের আরাধ্য বস্তুকে বর্ত্তমানে পাইয়া আর সে প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে চান না,—তাঁহারা বর্ত্তমানেই ত্রিবিধ সংস্থান দর্শন করেন। এক স্থানে সকলই পান; অন্যত্র দৃষ্টি করিবার, অন্যত্র অনুরাগী হইবার তাঁহাদের প্রয়োজনাভাব। নির্ম্মলা ভক্তিতে জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম,—ইহারা সকলে আসিয়া মিলিত হয়। নির্ম্মলা ভক্তিতে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা,—ইহাঁরা সকলে আসিয়া বর্ত্তমান হন।

পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা,—এই স্ফূর্ত্তি বা পুরুষত্রয়ের যেটীকে যখন দেখিতেছ, অংশ বা অপূর্ণভাবে দেখিতে পারিবে না। তুমি যেটী ধরিবে, সেটী অন্য সত্বাদ্বয়ের সঙ্গে অভেদ ও অখণ্ড। খণ্ড ও ভেদজ্ঞানে ধরিলে তোমার কিছুই ধরা হইল না। ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠার প্রত্যেক স্থলেই তিনি "একমেবা-

দ্বিতীয়ং” এক অনন্ত, পূর্ণ, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর। সেখানে দ্বৈত-ভাবও নাই, ত্রিত্ব-ভাবও নাই। খ্রীষ্টীয় সমাজে এই জন্য “পিতাও অনন্ত, পুত্রও অনন্ত, পবিত্রাত্মাও অনন্ত; কিন্তু তিন অনন্ত নহে, একই অনন্ত,”—এইরূপ মত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই ত্রিবিধ প্রতিষ্ঠাতেই এক অখণ্ড পূর্ণ পদার্থ, এক অদ্বৈত-তত্ত্ব বিরাজমান রহিয়াছে।

. পরব্রহ্মের পরম লীলার এইরূপে প্রকট হইয়া থাকে। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। ইহা তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার অনুপ্রাণন দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

এই ত্রিত্ববাদ বুদ্ধি-চক্ষুর নিকট চিরকালই অর্থশূন্য ভ্রান্তি বলিয়া অগ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ভক্ত সাধকদিগের উহা অতি আদরণীয়, সন্তজনীয়, অনুভব্য সামগ্রী। এই ত্রিবিধ ত্রিত্ববাদের মধ্যে ভারতের পৌরাণিক ত্রিত্ববাদ, ভক্ত সাধক-দিগেরপ্রাণের ভূমি পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্রমধ্যে কখনও পূর্ণাঙ্গে প্রচারিত হয় নাই। ইহা তাঁহাদের প্রাণের প্রিয়তম সামগ্রী ছিল। ভাগবতের ত্রিত্ববাদ সাধকবৃন্দের অতি গুহ্য সামগ্রী হইলেও পূর্ণাকারে শাস্ত্র-মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ খৃষ্টের ও তাঁহার শিষ্যবর্গের পরবর্ত্তী সময়ে খৃষ্টীয় সমাজ দ্বারা মতাকারে বিবৃত ও সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছে। ভারতের দ্বিবিধ ত্রিত্ব-বাদ অতি উদার ও অতি প্রশস্ত; খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতর। ভারতের দ্বিবিধ ত্রিত্ববাদের একই অর্থ, কেবল ব্রাহ্মণের স্থানে ভগবান্ এবং ব্রহ্মণ্যদেবের স্থানে পরমাত্মা আখ্যা প্রযোজ্য হইয়াছে। ভারতীয় এই দ্বিবিধ ত্রিত্ববাদে পরব্রহ্মের স্বাভাবিক কার্য্যপ্রণালীই বিবৃত হইয়াছে। সেই ত্রিত্ব-বিকাশ

কোন দেশ বা কালে আবদ্ধ নহে। তাহা নিত্য স্রোতরূপে প্রবহমান রহিয়াছে। সে স্রোত জাতিবিশেষের মধ্যেও আবদ্ধ নহে। হিন্দু, যবন,—উভয় জাতির মধ্যে তাহার স্ফূর্ত্তির সমান সম্ভাবনা রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ত্রিত্ববাদ, কেবল একবার মাত্র, কেবল একমাত্র দেশে, কেবল একমাত্র অনুগৃহীত জাতির মধ্যেই প্রকট লীলা বিস্তার করিয়া চিরকালের জন্য লীলাধাম পরিত্যাগ করিয়াছে। খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ভারতীয় সাধকগণের ন্যায় এই প্রকট লীলার নিত্যত্ব, সার্ব্বভৌমিকত্ব দেখিতে পান নাই,—এই ত্রিত্ববাদে নিত্য লীলার তরঙ্গপ্রবাহ দর্শন করেন নাই।

কর্ম্ম-বৃক্ষের অন্যান্য সমস্ত সুচারু ফল, যাহা কিছু কর্ম্মবীজ হইতে উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা বলিয়া এই প্রবন্ধ মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই য়ীহুদা দেশে বিশেষ ভাবে এবং ভারত-বর্ষের পৌরাণিক সময়ে সাধারণভাবে ফলিয়াছিল;—যেমন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার ভাব, তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ও করুণার ভাব, জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে, জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন, তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব ইত্যাদি। এস্থলে তাহাদের বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তবে বিশেষ কয়েকটী কথা না বলিয়া প্রস্তাবটী উপসংহার করিতে পারিতেছি না।

খৃষ্টীয় সমাজের কয়েকটী নীতিমূলক শিষ্টাচার দেখিলে বিমোহিত হইতে হয়। তাহার একটী,—ঈশ্বরোপাসনার পূর্ব্বে দেখা যে, আমি কাহারো বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করিয়াছি কি না? যদি কাহারও নিকট আমি কোন অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকি, উপাসনার অগ্রে তাঁহার নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা

দ্বারা অপরাধ ভঞ্জন করা; তৎপরে উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া। ঐ ব্যবহারের মূল খৃষ্টের উপদেশ। কর্ম্মক্ষেত্রে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে গেলে এ উপদেশটী সর্ব্বাগ্রে পালনীয়; স্বর্গরাজ্যে ঈশ্বর সন্নিধানে পূজোপহার লইবার পূর্ব্বে বিবাদ ভঞ্জন আবশ্যক। ইহা সহজসাধ্য নহে,—ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা কাহাকেও হীন হইতে হয় না; কিন্তু মানুষের কাছে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা হীন হওয়া বড়ই কঠিনসাধন। ইহা সাধন করিতে অনেক স্থলে আমাদের ক্ষমতায় কুলায় না। এরূপ অপরাধে অপরাধী হইলে সকলেই ঈশ্বরের কাছে সহজে মিটাইয়া লইতে চান।

তাহার আর একটী,—আমাদের প্রতি যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহাদিগকে অগ্রে ক্ষমা করিয়া, তাহাদের সঙ্গে অগ্রে অন্তরে মিলিত হইয়া, পরে উপাসনা করা। যাঁহারা মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এই শিষ্ট ব্যবহারের মূলও খৃষ্টের উপদেশ। যীশু বলেন, তুমি যদি কাহারো অপরাধ মার্জ্জনা না কর, তবে কেমন করিয়া ঈশ্বরের নিকট স্বকৃত অপরাধের মার্জ্জনা চাহিবে? তুমি অগ্রে ক্ষমা করিয়া রাখিলে, ঈশ্বরের তাঁহাকে ক্ষমা করিবার কোন বাধা থাকিবে না।

এই শিষ্টাচার দ্বয়ের অনন্ত মূল্য। এরূপ ভাবে আর কোথায়ও নিজের দোষ ক্ষমা প্রার্থনা করিবার ও অন্যের দোষ ক্ষমা করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মদিগেরও এই উপদেশ দ্বয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। নচেৎ একটী উন্নত সমাজ গঠন তাঁহাদের পক্ষে নিশ্চয়ই অসম্ভব হইবে।

অন্যের প্রতি যে অপরাধ কৃত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ ঈশ্বরের নিকট সকাতর অনুতাপে বিধৌত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব যৎপ্রতি অপরাধ কৃত হইয়াছে, সে জীবিত থাকিতে,—পথে থাকিতে, অপরাধ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ; নচেৎ তোমাকে নিশ্চয়ই অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে, তাহা হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। যে মানুষের প্রতি অপরাধ কৃত হইয়াছে, সেই মানুষের দেহে বসিয়া, তাহার সঙ্গে মিশিয়া ভগবান্ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, অন্যত্র বসিয়া তাহা কদাচিত করেন না।

এই সকল সমীচীন ভাব খৃষ্ট-শাখার কর্ম্ম-বৃক্ষ হইতে ফলিয়া জগতে প্রচারিত হইয়াছে। এ সকল মর্ত্ত্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।